রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজ— ৭ম সংখ্যা

রহস্য-চক্রে রমলা

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

দি ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোম্পানী
১০৫, কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

জানুয়ারী ১৯৪১

দাম ঃ ছয় আনা

দি ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোম্পানীর পক্ষ হইতে শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক প্রকাশিত ; এবং ট্রুথ প্রেস ৩, নন্দন রোড হইতে শ্রীসুধাংশুরঞ্জন সেন
কর্ত্তৃক মুদ্রিত

রহস্য-চক্রে রমলা

এক

অকস্মাৎ একটা অনির্দেশ্য আতঙ্কের চমক্ লাগিয়া রমলার ঘুম ভাঙিয়া গেল। কয়েক মিনিট চুপচাপ থাকিয়া ধীরে ধীরে সে উঠিয়া বসিল। মৃদু নীল আলোয় শয়ন কক্ষটি আলোকিত। চারিদিকে চাহিয়া লইয়া রমলা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। মধ্যে কেহ কোথাও নাই। নূতন বাড়ীতে বোধ হয় অকারণেই তার গা ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিয়াছে। রমলা শয্যা ছাড়িয়া উন্মুক্ত জানলার ধারে আসিল। মাথাটা গরম হইয়াছে; ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে আরাম পাওয়া যাইবে।

নীচেকার বিস্তীর্ণ বাগান এবং চারিপাশের তৃণাচ্ছন্ন জমি জ্যোৎস্নার আলোয় যেন ছবির মত সুন্দর দেখাইতেছে। তাহাদের

রহস্য-চক্রে রমলা

পল্লীভবনের এই প্রাসাদোপম অট্টালিকা বহুদিন খালি পড়িয়াছিল, সম্প্রতি তাহার পিতা বিখ্যাত রেলওয়ে কর্ম্মচারী রায় সাহেব হেমচন্দ্র সরকার মহাশয় কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া জমিদারী দেখা-শোনার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং বহুদিনের অনধিকৃত পূর্ব্বপুরুষের এই ভিটায় আসিয়া বসবাস করিতে সুরু করিয়াছেন।

নিমৃতিতার সরকার-বংশ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। বল্লাল সেনের সময় জনার্দ্দন নামে হেমচন্দ্রের এক পূর্ব্বপুরুষ নিজের শক্তিতে আসাম অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করিয়া প্রভূত অর্থ এবং রাজসম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক প্রকার কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়।

রমলা হেমচন্দ্রের একমাত্র সন্তান। এখনো বিবাহ হয় নাই। বাপের চাকরীর স্থান-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সে-ও ভারতের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছে। একবার বিলাত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিয়াছে। হেমচন্দ্র নিজেও যেমন সাহেবি ভাবাপন্ন, মেয়েকেও সেইভাবেই মানুষ করিয়াছিলেন।

জানালার ধারে দাঁড়াইয়া রমলা ভাবিতে লাগিল, আচ্ছা বোকা মেয়ে সে যাহোক, অনর্থক ভয় পাইয়া এমন সুন্দর ঘুমটা মাটি করিল! সারা বাড়ী সুসুপ্ত; নীচে তাহার পিতা নিজের শয়ন-ঘরে নিদ্রা যাইতেছেন; মাঠের ধারে ভৃত্যদের ঘরগুলাতে তাহারাও ঘুমের আরাম উপভোগ করিতেছে, আর শুধু সে···

ও কি! বাগানের ধারে ও কার ছায়া! রমলার দৃষ্টি সচকিত হইল! মানুষের মত আকার, অথচ যেন মানুষ নয়, ছায়ার

মত কি যেন একটা গাছের আড়াল হইতে সরিয়া যাইতেছে···
তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন কালো পর্দ্দায় আবৃত !

রমলার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। বহুদিনের পুরাণো জনশ্রুতি তাহার মনে পড়িয়া গেল ; সরকার-বংশের এই বাড়ীতে, লোকে যাহাকে "সরকার-বাড়ী" বলিয়া অভিহিত করে,—এই বাড়ীতে বহু বছর হইতে হানা দেয় এক অপদেবতা ; লোকে তাহার নামকরণ করিয়াছে, 'মৃত্যুদুত' ! যখনই তাহার আবির্ভাব হইয়াছে, তখনই নাকি এই বংশে চরম দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে ; 'মৃত্যুদুতের' আকৃতি কেহ কখনো দেখে নাই, শুধু শোনা গিয়াছে, একটা বামনাকৃতি মানুষের মত ঘোর-কালো ছায়া বেঁটে এবং স্থূল পা ফেলিয়া রাত্রে সরকার-বাড়ীর বাগানের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায় !

কিছুক্ষণ রমলা নিষ্পলক নেত্রে সেই চলন্ত ছায়ার দিকে তাকাইয়া রহিল।···ও কিসের শব্দ ! বাড়ীর কোথায় যেন একটা দরজা সশব্দে খুলিয়া গেল···দ্রুত পদধ্বনি···

একটা অর্দ্ধস্ফুট ভয়ার্ত্ত চিৎকার করিয়া রমলা নিজের ঘরের দ্বার খুলিয়া ফেলিল। আবার শব্দ ! আর-একটা দরজা দড়াম্ করিয়া খুলিল। নীচের তলায়।

দেওয়ালে হাত দিয়া রমলা সুইচ টিপিল। সম্মুখেই নীচে নামিবার সিঁড়ি। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নাই। রমলা সিঁড়ির দিকে পা বাড়াইল। কোনক্রমে পিতার নিকট পৌছিতে পারিলেই সে নির্ভাবনা হয়।

নীচে নামিয়াই তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল ; সুমুখেই হেমচন্দ্রের

শয়ন-ঘর ; কিন্তু তার দ্বার এ-ভাবে উন্মুক্ত কেন ? রমলা সবেগে ঘরে ঢুকিল। অন্ধকার ঘর। খোলা জানলা দিয়া স্বচ্ছ চাঁদের আলো আসিয়া সমগ্র ঘরটিকে আলোকিত করিয়াছে। অদূরে তাহার পিতার বেলোয়ারি-খাটের উপর সুবিন্যস্ত শয্যা···কিন্তু শয্যা শূন্য···হেমচন্দ্র ঘরে নাই। খাটের পাশেই একটি সুদৃশ্য আন্‌লায় হেমচন্দ্রের রাত-কাপড় আর বাদামি রঙের ড্রেসিং গাউন থাকিত ; তাহাও নাই !

রমলা দরজার দিকে ফিরিয়াছে এমন সময় বাহিরে বাগানের ভিতর দিক হইতে তীক্ষ্ণ তীব্র আর্ত্তনাদ ভাসিয়া আসিল···তাহার পরক্ষণেই দুইবার পিস্তলের শব্দ। টলিতে টলিতে রমলা বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল···যেদিক হইতে পিস্তলের গর্জ্জন ভাসিয়া আসিয়াছিল সেদিকে চাহিতেই তাহার নজরে পড়িল, অদূরে ঘাসের উপর···বাদামি ড্রেসিং গাউন পরা···তাহার বাবা··· শুধু তাই নয়, শায়িত দেহের উপর বামনাকৃতি একটা ছায়া, দুই হাত বাড়াইয়া যেন তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিয়াছে············

রমলার মাথা ঘুরিতে লাগিল···প্রাণপণে সে চিৎকার করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু গলা দিয়া স্বর ফুটিল না···চেতনা হারাইয়া সেইখানেই সে লুটাইয়া পড়িল।

রহস্য-চক্রে রমলা

পরদিন সকাল।

সুপরিচিত বে-সরকারী গোয়েন্দা মোহনলাল নিজের বাড়ীর একটি ছোট ঘরে কয়েকটি তরল পদার্থপূর্ণ শিশি এবং যন্ত্রপাতি লইয়া একটি পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিল। এই ছোট ঘরটি তাহার রসায়নাগার। কোন হস্তরেখার পরীক্ষা বা অন্য কোনরূপ গবেষণার প্রয়োজন হইলে সে এই ঘরটিকে ব্যবহার করে। নানাবিধ বহুমূল্য যন্ত্রপাতির দ্বারা ঘরটি সজ্জিত।

বর্ত্তমানে মোহনলাল একটি অপ্রচলিত বিষের স্বরূপ নির্ণয়ে-ব্যাপৃত ছিল। পরীক্ষাটি সবেমাত্র সম্পূর্ণ হইয়াছে। একটি কাঁচের পাত্রে কয়েক ফোঁটা নীলবর্ণ তরল পদার্থ রহিয়াছে। সম্মুখে একখানা পাতাখোলা মোটা বই হইতে কয়েকটা কথা খাতার পাতায় লিখিয়া লইয়া মোহনলাল বই বন্ধ করিয়া পাশের ঘরে আসিল এবং টেবিল লইতে টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া ডিটেক্-টিভ অফিসে ফোন করিল।

ক্ষণকালের মধ্যেই উত্তর আসিল। মোহনলাল জানাইল, সে চীফ-ইন্‌স্‌পেকটার কবীরের সঙ্গে কথা বলিতে চায়। মিনিটখানেক পরে সাড়া আসিল। মোহনলাল বলিল—কে? ইনসপেকটার কবীর? সুপ্রভাত। শোনো; আমার পরীক্ষা শেষ হয়েছে। তুমি নরহরিকে গ্রেপ্তার করতে পারো। হ্যাঁ, খুন, তাতে আর সন্দেহ

নেই। গেলাসের মধ্যে কোনাইল নামে একপ্রকার উগ্র বিষ ছিল, আমি তা আবিষ্কার করেছি। হ্যাঁ; খবর দিও।

টেলিফোন রাখিয়া মোহনলাল ভৃত্যকে আহ্বান করিতে যাইবে এমন সময় দ্বারপ্রান্তে একটি তরুণীকে দেখা গেল। জিজ্ঞাসুমুখে তাহার পানে চাহিতেই মেয়েটি দুইহাত জোড় করিয়া কহিল—নমস্কার। ভিতরে আসতে পারি?

—আসুন; বলিয়া মোহনলাল ঈষৎ বিস্মিতভাবে তরুণীর দিকে একখানি চেয়ার আগাইয়া দিল। মেয়েটির মুখ একেবারে অপরিচিত নয়। কোথায় সে যেন তাহাকে ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছে।

মেয়েটি নিজের পরিচয় দিতেই মোহনলালের মনে পড়িল। পিতার সহিত ইহাকে কলিকাতার অভিজাত সমাজের বহু সম্মেলনে সে দেখিয়াছে এবং ইহার পিতার সহিত আলাপের সময় মেয়েটির সঙ্গেও অনেক সময় কথা বলিয়াছে। কিন্তু হঠাৎ এ-সময় তাহার আগমনের কারণ কি?

মেয়েটির কথার উত্তরে মোহনলাল বলিল—আপনাকে আর বেশী পরিচয় দিতে হবে না রমলা দেবী। আপনার বাবার সঙ্গে আমার একাধিকবার আলাপ হয়েছে, তখন আপমার সঙ্গেও পরিচয় হবার সৌভাগ্য ঘটেছে। এখন বলুন, আমি কি করতে পারি আপনার জন্যে।

রমলা অস্ফুট ধীর কণ্ঠে বলিল— আমি বড় বিপদগ্রস্ত মোহনলাল বাবু, তাই আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি।

—বিরক্ত কিছুমাত্র নয়। আপনি বিনা দ্বিধায় বলুন, কী

আপনার বিপদ। একটা কথা, আপনি কি সোজা নিমতা থেকে আমার কাছে আসছেন?

ঘাড় নাড়িয়া রমলা বলিল—হ্যাঁ। বিপদে পড়ে আপনার কথাই সব প্রথম মনে পড়ল। তাই চলে এলাম।

—বেশ করেছেন। এখন আপনি ধীরে সুস্থে এবং নিঃসঙ্কোচে বলুন আপনার যা কিছু বলবার আছে।

ঈষৎ নীরব থাকিয়া রমলা বলিল—কিন্তু কেমন ভাবে যে বলব তা বুঝতে পারছি না···

—আপনি গোড়া থেকে সুরু করুন।

মোহনলাল নিরতিশয় কৌতুহলী হইয়াছিল। কি এমন গোপন বিপদ এই মেয়েটির জীবনে অকস্মাৎ ঘনাইয়া উঠিয়াছে, যাহা বলিতে তাহার এত কুণ্ঠা, এত ভয়!

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া রমলা বলিল—কাল রাত থেকেই বলি। কাল রাতেই আমি প্রথম ভয় পাই।

—ভয় পান! কেন?

—বলছি। বলিয়া রমলা ধীরে ধীরে গত রাত্রির কথা বলিতে লাগিল; অকারণে তাহার নিদ্রাভঙ্গ, তারপর বাগানের ভিতর কালো ছায়া, 'মৃত্যুদূতের' প্রবাদ, দরজা খোলার শব্দ, পিতার শূন্য শয্যা, দু'বার পিস্তলের গর্জ্জন, তারপর বাগানের মধ্যে পিতার দেহ ও কালোভূতের আবির্ভাব—একটির পর একটি ঘটনা রমলা গল্পের মত বলিয়া গেল।

মোহনলাল স্তব্ধ-বিস্ময়ে শুনিতেছিল; রমলা থামিলে মৃদুকণ্ঠে কহিল—তারপর কি হ'ল?

রমলা বলিতে লাগিল—কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলাম জানিনা, জ্ঞান হ'য়ে দেখলাম, আমাদের পুরণো বুড়ো চাকর জয়রাম আমার চোখেমুখে জল দিচ্ছে। আমি সুস্থ হ'য়ে উঠে দাঁড়ালে সে বললে, পিস্তলের আওয়াজ শুনে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়, তারপর সে বারন্দার ধারে এসে আমাকে এইভাবে পড়ে থাকতে দেখে। বাবার ঘরেও সে ঢুকেছিল, কিন্তু বাবাকে দেখতে পায় নি। ইতিমধ্যে বাড়ীর অন্য চাকরদাসীগুলোও জেগে উঠেছিল; তারা আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। দাই-মা নিস্তারিণীকে আমার কাছে বসিয়ে জয়রাম বাবাকে খুঁজতে বাগানে নেমে গেল। কিছুক্ষণ পরে সে ফিরে এলো। আমি তাকে যা দেখেছিলাম সব বললাম। সে বললে, আমার নিশ্চয় ভুল হয়েছিল, কাবণ বাগানে কেউ নেই, বাবাকেও সেখানে দেখা যায় নি। অনেকক্ষণ কেটে গেল কিন্তু তবুও বাবা ফিরে এলেন না, তখন জয়রাম বিচলিত হ'য়ে ড্রাইভার মোরাদকে নিয়ে বাগানের চতুর্দ্দিকে বাবাকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। আমিও অস্থির হয়ে নিস্তারিণীকে সঙ্গে নিয়ে বাগানে নামলাম। আমার দৃষ্টি-বিভ্রম হয়নি, মোহনলালবাবু; আমি দেখলাম, যেখানে বাবা পড়েছিলেন, সেই জায়গায় ঘাসের ওপর মানুষের শরীরের ছাপ, আর তারই পাশে ফোঁটা ফোঁটা তাজা রক্ত···

বলিতে বলিতে রমলার সর্ব্বদেহ শিহরিয়া উঠিল, তাহার বাক্য রুদ্ধ হইল। মোহনলাল কিছু বলিল না, নীরবে তাহার পরবর্ত্তী কথার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে রমলা বলিল—ভোর হয়ে গেল, তখনও বাবার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

ভয়ে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। হঠাৎ আপনার কথা আমার মনে পড়ল। গোয়েন্দাগিরিতে আপনার খ্যাতির কথা আমি অনেক বার শুনেছি; মনে হ'ল এ ব্যাপারে আপনার সাহায্য নেওয়া দরকার; তাই আমি তখনই মোরাদকে গাড়ী বার করতে বললাম এবং তারপর সোজা আপনার কাছে চলে এসেছি। আমার একান্ত অনুরোধ মিঃ মিত্র, আপনাকে আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ী যেতে হবে, এবং এই ব্যাপারের মীমাংসা করে দিতে হবে। আমি জানি, আপনার সময়ের দাম অনেক; যদি মনে না করেন, আপনার প্রাপ্য দিতে আমি কুণ্ঠিত············

মৃদু হাসিয়া মোহনলাল বলিল—পয়সা নিয়ে আমি এ কাজ করি না মিস সরকার। তবে আপনার অনুরোধ আমি রক্ষা করব। ব্যাপারটা আমায় অত্যন্ত কৌতূহলী ক'রে তুলেছে।

—ধন্যবাদ। রমলা স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিল।

মোহনলাল কহিল—আমি তৈরী হ'য়ে নি, ততক্ষণ আপনি একটু চা খান, মিস সরকার; সকাল বেলায় বোধ করি আপনার কিছু খাওয়া হয় নি।

রমলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আপনার অনুমান মিথ্যা নয়। আমি চা খাব।

মোহনলাল ভৃত্যকে ডাকিয়া চা, রুটি প্রভৃতি আনিতে বলিল। তারপর দু'জায়গায় দুইটা টেলিফোন করিল। চা পান করিয়া রমলা আরাম ও সুস্থ বোধ করিল। তাহার মুখের পাংশু আভা অনেকখানি মিলাইয়া গেল।

মোহনলাল বলিল— এইবার এ বিষয়ে দু'একটা কথা আপনার সঙ্গে আলোচনা করা যাক, মিস মিত্র। আপনি আপনার বাবার জন্যে উতলা হয়েছেন, কিন্তু এমন ত হ'তে পারে যে রায় সাহেব ইচ্ছা করেই কারুকে না জানিয়ে কোথাও গেছেন এবং এখনো ফিরছেন না!

মাথা নাড়িয়া রমলা কহিল—তা কেমন ক'রে হবে? বাবার পরনে ছিল পাজামা আর ড্রেসিং গাউন; সে-অবস্থায় কোথাও চলে যাওয়া কি সম্ভব?

—বোধ হয় সম্ভব নয়; মোহনলাল বলিল—আমি শুধু একটা অনুমান করছিলাম। আচ্ছা, বারান্দার ধারে এসে আপনি বাগানের মধ্যে যে-লোকটিকে পড়ে থাকতে দেখেন, তিনি যে আপনার বাবা তা কেমন করে নিশ্চয় বুঝলেন?

রমলা উত্তর দিল—আমি তাঁর বাদামি রঙের ড্রেসিং গাউন দেখেই বুঝেছিলাম যে বাবা পড়ে আছেন।

—আপনি তাঁর মুখ দেখতে পান নি?

—না; অনেকটা দূর বলে আমি তাঁর মুখ দেখতে পাই নি।

ক্ষণকাল নীরবে কি চিন্তা করিয়া মোহনলাল বলিল—দু'বার পিস্তলের আওয়াজ শুনেছিলেন—সে শব্দ দূর থেকে এসেছিল, না কাছেই শব্দ পেয়েছিলেন?

—খুব কাছেই। জানলার পিছনে বললেই হয়।

মোহনলাল পুনরায় প্রশ্ন করিল—একটা শব্দের পর আর-একটা শব্দ কি সঙ্গে সঙ্গেই হয়েছিল, না খানিকক্ষণ দেরীতে?

—সঙ্গে সঙ্গেই দুটো শব্দ হয়েছিল।

—আচ্ছা, মিস সরকার, রায় সাহেবের কোন শত্রু ছিল বলে আপনার জানা আছে?

মাথা নাড়িয়া রমলা উত্তর দিল—না, আমার জানা নেই। বাবা সকলের কাছেই প্রিয় ছিলেন; নিম্‌তার সকলেই তাঁকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, কলকাতা বা অন্য জায়গাতেও তিনি যাদের সঙ্গে মিশতেন তারা সকলেই তাঁকে সম্মান করত। তবে ইদানিং তিনি কারুর সঙ্গেই মিশতেন না, সব সময়েই নিজের পড়ার ঘরে কি কতকগুলো কাগজ-পত্র নিয়ে সময় কাটাতেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল যে তিনি সরকার-বংশের একটা গুপ্ত-রত্নের রহস্য আবিষ্কার করেছেন।

মোহনলাল উচ্চকিত হইল। কহিল—সরকার-বংশের গুপ্ত-রত্ন! সেটা কি ব্যাপার?

রমলা কি উত্তর দিতে যাইবে এমন সময় একটি যুবক ঘরে ঢুকিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল; ঘরের ভিতর কোন মহিলার উপস্থিতি সে বোধ হয় প্রত্যাশা করে নাই। তাহাকে ফিরিতে উদ্যত দেখিয়া মোহনলাল কহিল—আরে, যেওনা সতু। এসো, বোসো।

তারপর রমলার দিকে ফিরিয়া কহিল—মিস সরকার। এ ছেলেটি আমার সব কাজের সঙ্গী, সতু শিকদার। তাই আমার মতো এর কাছেও আপনি কোন সঙ্কোচ করবেন না। আপনার সাহায্যে যদি আমি যাই, তাহলে সতুও আমার সঙ্গে যাবে, তাই এরও সব কথা শোনা দরকার।

এই বলিয়া মোহনলাল সতুর কাছে সংক্ষেপে রমলার পরিচয় দিল এবং এখানে আসিবার কারণ বিবৃত করিল।

ক্ষণেক পরে রমলা কহিল—গুপ্ত-রত্নের কথা বলতে গেলে, 'মৃত্যু দূতের' প্রবাদের কথাটাও এসে পড়ে। আমি সব কথা খুঁটিনাটি জানি না। সংক্ষেপে এই জানি যে, জনার্দ্দন নামে সরকার-বংশের এক পূর্ব্বপুরুষ খুব প্রতাপশালী ছিলেন, তখনকার সময়ে বাংলা দেশের যিনি রাজা ছিলেন, তারই মত ছিল তাঁর প্রতিপত্তি। তাঁর নিজের অনেক সৈন্য-সামন্ত ছিল; সেই সব সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তিনি একবার আসামের দিকে যুদ্ধ-যাত্রা করেন। মণিপুর রাজার কয়েকটা দুষ্প্রাপ্য এবং বহুলক্ষ টাকা দামের মণি-মুক্তা ছিল, সেই রত্ন থাকতো একটা প্রবালের কৌটায় মণিপুর-রাজবাড়ীর এক নিভৃত ঘরে। জনার্দ্দন মণিপুর রাজ্য লুঠ করে সেই প্রবালের কৌটা সংগ্রহ করেন। বাংলাদেশের রাজ-অনুচরদের মধ্যে অনেকেই আমাদের সেই পূর্ব্বপুরুষকে হিংসা করত। তাদের মধ্যে ছিল এক বামন। সয়তানি বুদ্ধিতে সেই বামন ছিল অদ্বিতীয়; সে কেমন করে খবর পায় যে জনার্দ্দন সেই প্রবালের কৌটা হস্তগত করেছে। এই খবর পেয়ে বামন আসাম রওনা হয় এবং পথের মধ্যে জনার্দ্দনের সাক্ষাত পেয়ে তার পিছু নেয়। বামনের সঙ্গে কয়েকজন সয়তান অনুচরও ছিল। জনার্দ্দন বামনের মতলব বুঝতে পারেন, তাই একদিন রাত্রে বামন যখন তাঁকে খুন করতে তাঁর তাঁবুতে প্রবেশ করে তখন তিনি প্রস্তুত হয়েই ছিলেন; দুজনের মধ্যে লড়াই হয়, বামন সেইখানেই মারা পড়ে এবং জনার্দ্দনও

সাংঘাতিক জখম হন। শত্রুদের হাত এড়িয়ে কোন ক্রমে নিজের বাড়ীতে পৌঁছে তিনি সেই প্রবালের কৌটা একস্থানে লুকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করেন এবং কয়েকদিন পরে মরবার দিন একটা কাগজে গুপ্তস্থানের ইঙ্গিত লিখে দিয়ে যান। এই সব কাহিনী জনার্দ্দনের এক বিশ্বস্ত অনুচর তালপাতার পুঁথিতে লিখে রেখে গেছে; সেই সাঙ্কেতিক কাগজখানাও আছে; কিন্তু গুপ্তরত্নের সন্ধান এ-পর্য্যন্ত কেউ পায় নি। বাবার বিশ্বাস, সেই সাঙ্কেতিক-পত্রের সূত্র তিনি আবিষ্কার করতে পেরেছেন। 'মৃত্যুদূত' সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, জনার্দ্দনের হাতে নিহত সেই বামনের প্রেতাত্মা প্রতি-শোধের আকাঙ্ক্ষায় সরকার-বাড়ীতে রাত্রে হানা দেয়, এবং তার আবির্ভাব ঘটলেই, আমাদের বংশে কোন ভীষণ বিপদ বা কারুর মৃত্যু ঘটে।

রমলা তাহার সুদীর্ঘ কাহিনী শেষ করিয়া নীরব হইল। ঘরের মধ্যে তিনজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। মোহনলাল গভীর চিন্তামগ্ন।

মিনিট তিনেক পরে সে কহিল—আচ্ছা মিস সরকার, রায় সাহেব যে সাঙ্কেতিক পত্রখানা আবিষ্কার করেছিলেন, তার মধ্যে কি লেখা আছে, আপনি জানেন?

রমলা বলিল—সংস্কৃতে একটা শ্লোক লেখা আছে; সংস্কৃতটা মনে নেই, তবে তার বাংলা করলে এই রকম দাঁড়ায়:—

ধনুক থেকে তীরটি ছাড়া হ'লে
একদিকে সে যায়—

উত্তর কি দক্ষিণ, পশ্চিম কি পূব—
বাতাস যেথা বয়, সেখান থেকে নয়।
শেষে যেথায় থামে গিয়ে তীর
সেইখানেতে খুঁজে পাবে, হয়ো না অস্থির।

এ-রকম আবোল তাবোল ছড়ার যে কি মানে হ'তে পারে তা তো আমি ভেবে পাই নে, মোহনলালবাবু!

চিন্তিতভাবে মোহনলাল বলিল—আপাতদৃষ্টিতে এর কোন অর্থ নেই বটে কিন্তু আসলে এর মূল্য হয়ত অল্প নয়। আমি একবার মূল সংস্কৃত শ্লোকটা এবং সেই পুঁথিখানি দেখতে চাই।

—বেশ তো, বাবার পড়বার ঘরে আছে, গেলেই দেখতে পাবেন্। তাহলে..........

মোহনলাল ঘাড় নাড়িয়া বলিল—তাহলে আমরা এখনি রওনা হব, মিস সরকার। সতু, তুমি দুটো স্লটকেসে প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র ভরে নাও, বলদেওকে বল চট্‌পট গুছিয়ে দিক।

সতু তৎপরতার সহিত বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল। স্থির হইল, মোহনলালের সহিত সে-ও যাইবে। এই যুবকটিকে মোহনলাল বিশেষ স্নেহ করে। সতু তাহার প্রিয় শিষ্য। রেঙ্গুনে গোয়েন্দাগিরির কাজে সে এতদিন নিযুক্ত ছিল, সম্প্রতি বছর খানেকের ছুটি লইয়া দেশে আসিয়াছে। সর্ব্ববিষয়ে মোহনলালের উপযুক্ত সহকারী। *

* মোহনলাল ও সতুর পূর্ব্ববর্ত্তী অভিযান এই সিরিজের ২য় সংখ্যা "মগের মুলুকে মোহনলাল" গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

যাত্রার আয়োজন হইতেছে এমন সময় টেলিফোন বাজিল। মোহনলাল রিসিভার ধরিয়া পরক্ষণেই রমলার দিকে ফিরিয়া কহিল—আপনার জন্যে, আপনাদের বাড়ী থেকে করছে।

রমলা কহিল—হাঁ, আমি ব'লে এসেছিলাম যে আমি আপনার এখানে আসছি এবং দরকার হলে যেন আমায় ফোন করা হয়। বোধ হয় বাবা ফিরে এসেছেন।

রিসিভার ধরিয়া দুইচারিটা কথার পরেই রমলা ভয়ার্ত্ত অস্ফুট শব্দ করিয়া ফোন ছাড়িয়া দিল। মোহনলাল তাহার কাছে আসিয়া কহিল — ব্যাপার কি? কে ফোন করছিল?

স্খলিত স্বরে রমলা কহিল—আমাদের বাড়ীতে ভয়ানক ব্যাপার ঘটতে সুরু করেছে মোহনলালবাবু। জয়রাম ফোন করছিল; সে বললে যে তারা এইমাত্র বাগানের মধ্যে আমাদের হেড-মালি ফনির মৃতদেহ দেখতে পেয়েছে; তার বুকে পিস্তলের গুলির দাগ। ফনিকে কে এ-ভাবে খুন করলে?

—তাই তো! খুন! তাহলে শেষ পর্য্যন্ত......কি ভাবিয়া মোহনলাল কথাটা শেষ করিল না।

তিন

তিনজনে মোটর-যোগে যখন নিমতার সরকার-বাড়ীতে পৌছিল তখন বেলা দশটা বাজে। বাড়ীর গেটের কাছে চাকর-বেহারার

দল মনিব-কন্যার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। গাড়ী হইতে নামিয়াই রমলা জয়রামকে ডাকিয়া বলিল—বাবার কোন খবর নেই, জয়রাম ?

—না দিদিমণি ! এদিকে ফনিলাল খুন ! আমরা সকলে বড্ড ভয়ে ভয়ে আছি ! পুলিশ এসেছে। তারা মালীর ঘরের কাছে তদন্ত করছে।

মোহনলাল প্রশ্ন করিল—তারা এত শিগ্‌গির খবর পেলে কি ক'রে ?

শান্তস্বরে জয়রাম জবাব দিল—আমি ফনির লাশ দেখতে পেয়েই পুলিশকে টেলিফোন করেছিলাম। এসব ব্যাপারে পুলিশকে জানানোই তো উচিত হুজুর !

—হ্যাঁ, তুমি ঠিক কাজই করেছো।

মোহনলাল সতুর দিকে চাহিয়া বলিল—চল, বাড়ীতে ঢোকবার আগে একবার ঘটনাস্থলটা দেখে আসা যাক। জয়রাম আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

রমলা উদ্বিগ্ন বিষণ্ণ অন্তরে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। জয়রাম মোহনলাল ও সতুকে লইয়া অন্য ধারে চলিল। সতু ও মোহনলাল উভয়েই সরকার-বাড়ীর শোভা ও আয়তন দেখিয়া রীতিমত বিস্মিত হইয়াছিল। প্রকাণ্ড বাড়ী; আশে-পাশে বাগানের আয়তনও দশবারো বিঘার কম হইবে না; ফুলের ক্ষেত, ফলের ক্ষেত, পুকুর, ফোয়ারা, লালমাছের চৌবাচ্ছা, একধারে ইলেকট্রিকের স্পেশাল ডায়নামো চলিতেছে, বিশেষ

ব্যবস্থা করিয়া টেলিফোন আনানো হইয়াছে, বাগানের মধ্যে বিচরণ করিলে মনে হয় যেন কোন আধুনিকতম বিলাসী ধনীর প্রমোদ কাননে বিহার করা হইতেছে।

রমলা পূর্ব্বেই জয়রামকে মোহনলাল ও সতুর পরিচয় দিয়াছিল। সে বিশেষ সম্ভ্রম সহকারে মোহনলালকে মালীর ঘরের দিকে লইয়া গেল। দেখা গেল, স্থানীয় দারোগা তাহের খাঁ দুইজন সহকারী লইয়া তদন্ত সুরু করিয়াছে। মোহনলালকে দেখিয়া সে সপ্রশ্ন নেত্রে তাহার দিকে চাহিতেই জয়রাম তাহার পরিচয় দিল। নামজাদা অভিনেত্রী কমলা গুপ্তার হত্যার ব্যাপারে * তাহের খাঁ মোহনলালের খ্যাতির কথা শুনিয়াছিল তাই সম্ভ্রমভরে তাহাকে নমস্কার করিয়া বলিল—আপনার সঙ্গে পরিচয় হ'য়ে বিশেষ বাধিত হলাম মিঃ মিত্র। বোধহয় এ-ব্যাপারে আপনাকে বেশী কষ্ট করতে হবে না—এ অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা; রাত্রে চোর বাগানে ঢুকেছিল, মালীটা তাকে বাধা দেয়, তাইতে সে গুলী চালায়। বেচারা ফনিলাল, লোকটা খুব ভাল ছিল, আমরা সকলেই ফনিলালকে চিনতাম।

মোহনলাল মাথা নাড়িয়া কহিল—আপনারা যখন রয়েছেন তখন বোধ হয় আমাদের বেশী মাথা ঘামাতে হবে না। যাই হোক, যখন এসেছি তখন একবার লাশটা দেখে যাই, কি বলেন?

—আসুন! আসুন। বলিয়া দারোগা মোহনলালকে পথ দেখাইয়া লইয়া গেল।

---

* এই সিরিজের ১ম গ্রন্থ 'বাগানবাড়ীর বিভীষিকা' দ্রষ্টব্য।

একটা ঘন কেয়া-ঝাড়ের পিছনে ফনিলালের দেহ পড়িয়া আছে। তাহার ডানহাতখানা এক পাশে প্রসারিত, আঙুলগুলা গুটানো, যেন মুঠা অর্দ্ধেক উন্মুক্ত; বাঁ হাত বুকের উপর স্থাপিত। বুকের কাছে তাজা রক্ত জমাট বাঁধিয়া গেছে।

মোহনলাল কয়েক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দে তীক্ষ্ণনেত্রে মৃতদেহটির পানে তাকাইয়া রহিল; তারপর দারোগার দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিল—লোকটির ডানহাতে মুঠোর মধ্যে কি পেয়েছেন, দারোগা সাহেব?

অবাক বিস্ময়ে দারোগা জবাব দিল—আমি যে কিছু পেয়েছি তা আপনি জানলেন কেমন ক'রে?

নীচু হইয়া আর-একবার মৃতদেহের ডানহাতটি পরীক্ষা করিয়া মোহনলাল বলিল—ডান হাতের মুঠির অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে যেন কোন কিছু শক্ত জিনিষ মুঠোর ভিতর থেকে টেনে বার করা হয়েছে।

প্রত্যুত্তরে দারোগা প্যাণ্টালুনের পকেট হইতে একটি সরু সোনার জিনিষ বাহির করিয়া মোহনলালের হাতে দিল।

একটি ছোট্ট গোল সোনার বল্, বড় মটরের মত বা ডুমুরের মত আকার, তাহার সঙ্গে একটি সরু চেনের ছিন্নাংশ!

তাহের দারোগা কহিল—এই বস্তুটি আমি ফনিলালের হাতে পেয়েছি।

মোহনলাল বলিল—জিনিষটি বোধ করি আলগা ভাবেই ফনিলালের হাতের মধ্যে ছিল; টেনে-হিঁচ্ড়ে বার করতে হয় নি?

দারোগা উত্তর দিল—খুব আল্‌গা ভাবেই ছিল, টানতেই বেরিয়ে এলো।

মোহনলালের ললাটে চিন্তার রেখা পড়িল। সতু দেখিল, ওই সোনার চেনের টুক্‌রাটির মধ্যে সে যেন অনন্ত রহস্যের আভাস পাইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে দারোগার দিকে ফিরিয়া মোহনলাল বলিল—আমি এটা আমার কাছে রাখলাম—একটু পরীক্ষা ক'রে দেখবো। আজকেই আপনাকে ফেরৎ দেব'খন।

দারোগা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। লকেট সমেত চেনটি পকেটে রাখিয়া মোহনলাল বলিল—সব প্রথম লাশ দেখতে পায় কে?

জয়রাম বলিল—সব প্রথম আমায় খবর দেয় ইদ্রু খানসামা।

মোহনলাল প্রশ্ন করিল—কতদিনের লোক সে?

জয়রাম জবাব দিল—অনেকদিনের লোক হুজুর। ছোট বয়সে কাজে লাগে, এখন বুড়ো হয়ে গেছে।

মোহনলাল, সতু ও জয়রামকে লইয়া চাকরদের ঘরগুলার দিকে গেল। একটা গাছের ধারে বসিয়া বুড়া খানসামা ইদ্রু মিঞা তামাক টানিতেছিল। তাহাদের দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম করিল।

কথায় কথায় জানা গেল, ইদ্রু কাঠ সংগ্রহ করিতে ভোরবেলা বাগানে বাহির হইয়া ফনিলালের মৃতদেহ দেখিতে পায়। সে ইহাও জানাইল যে, তাহার ঘণ্টাখানেক আগে সে আর-একবার সেই স্থান দিয়াই গিয়াছিল, তখন ফনিলাল সেখানে ছিল না,

তারপর ইতু কাছাকাছি নিজের কাজ করিতেছিল কিন্তু সে সময়ের মধ্যে সে কোন পিস্তলের আওয়াজ শুনিতে পায় নাই।

তাহার কথা শুনিয়া মোহনলাল উচ্চকিত হইল। কহিল—পিস্তলের শব্দ হয় নি তো লোকটা পিস্তলের গুলিতে মারা পড়ল কেমন করে? পিস্তল ছুঁড়লে তো শব্দ হবে। অবশ্য যদি শব্দহীন পিস্তল হয়............

—শব্দহীন পিস্তল নয় হুজুর! ফনি মানুষের হাতে মরে নি।

ইতুর কথা শুনিয়া মোহনলাল ও সতু একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—মানুষের হাতে মরে নি!

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া ইতু কহিল—আপনারা হয়ত হাসছেন, কিন্তু এ-বাড়ীতে যে প্রেতাত্মা হানা দেয় তা বোধ হয় আপনারা জানেন না! এক একদিন রাত্রে সে আসে হুজুর, আর, যে-দিন সে আসে সেদিন কেউ না কেউ............

—তুমি তাকে কোনদিন দেখেছো ইতু?

—না হুজুর। যে তাকে দেখে সে আর বেঁচে থাকে না। ফনিলাল তাকে দেখেছিল।

—কবে দেখেছিল?

ইতু মনে মনে হিসাব করিয়া বলিল—পরশু রাত্রে।

—তুমি কেমন ক'রে জানলে?

ইতু বলিল—সে আমায় কাল ভোরবেলা বলেছিল। পরশু রাত্তির যখন প্রায় দুটো তখন ফনি উঠেছিল, বোধ হয় পায়খানা যাবার দরকার পড়েছিল। সেই সময় সে দেখে, একটা কালো

বেঁটে ছায়া সর্ব্বদেহ কালো কাপড়ে ঢেকে লম্বা লম্বা পা ফেলে বাগান পেরিয়ে বাড়ীর দিকে যাচ্ছে। এই না দেখেই ফনি মার টেনে ছুট।

মোহনলাল পুনরায় প্রশ্ন করিল—এ-কথা সে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বলেছিল?

—কর্ত্তাকে বলেছিল হুজুর!

মোহনলাল তাহাকে আরও কয়েকটা প্রশ্ন করিল, কিন্তু আর কোন সদুত্তর পাওয়া গেল না। তখন তাহারা বাড়ীর দিকে ফিরিল।

* * *

বারান্দার ধারে সিঁড়ির ধাপে দাঁড়াইয়া রমলা একটি প্রিয়দর্শন যুবকের সঙ্গে কথা বলিতেছিল, মোহনলালকে ডাকিয়া তাহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিল।

ছেলেটির নাম গোপেন রুদ্র এবং মোহনলাল স্পষ্টই বুঝিল, ইহার সহিত রমলা প্রগাঢ় সখ্যতার বন্ধনে অবদ্ধ।

কয়েকটা কথার পর রমলা বলিল—বাবার হঠাৎ নিরুদ্দেশ হবার ব্যাপার আমি এঁকে বললাম মোহনলালবাবু···

গোপেন বলিল—অদ্ভুত ব্যাপার! তারপর ফনিলালের খুন—এও এক দুর্ব্বোধ্য রহস্য।

ঘাড় নাড়িয়া শান্তকণ্ঠে মোহনলাল বলিল—যখন কোন রহস্য-জনক দুর্ঘটনা ঘটে তখন প্রথম অবস্থায় সমস্তই এমনি দুর্ব্বোধ্য মনে

হয়। কিন্তু শীঘ্রই সে অবস্থা কেটে গিয়ে আসল ব্যাপার উদ্‌ঘাটিত হওয়া অসম্ভব নয়

—এ ক্ষেত্রেও তাই আশা করা যাক! গোপেন বলিল—আপনি ইতিমধ্যে কোন কিছু সন্ধান পান নি?

উত্তরে মোহনলাল পকেট হইতে লকেটটি বাহির করিয়া বলিল —শুধু এই ছেঁড়া-চেনটি পেয়েছি; দারোগা মালীর হাতে এটা দেখতে পায়। মনে হয়, কোন ঘড়ির চেন থেকে এটিকে ছিঁড়ে …ওকি! কি হ'ল আপনার! গোপেনবাবু!

গোপেনের মুখখানা হঠাৎ মড়ার মত ক্যাকাশে আর বিশ্রী হইয়া গিয়াছিল; মোহনলালের হাতের তালুতে রাখা সেই লকেটটির প্রতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ; সে-চাহনিতে যেন বিশ্বের আতঙ্ক মাখা…

স্খলিতস্বরে গোপেন বলিল—এ অসম্ভব—একেবারেই অসম্ভব! …তা যদি হয় তাহলে……না না……

চার

কয়েক মুহূর্ত্ত মোহনলাল স্তব্ধ-কৌতুহলে গোপেনের মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

রমলা তাহার হাতের উপর হাত রাখিয়া বলিল—কি হয়েছে! শরীর খারাপ লাগছে হঠাৎ!

ততক্ষণে গোপেন নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়াছে। কপালের

উপর ডানহাতখানা বুলাইয়া লইয়া সে কহিল—না, আমি ভাল আছি। হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে গিয়েছিল! বড্ড গরম কি না, তাই।

সে যে মিথ্যা কথা বলিল তাহা বুঝিতে মোহনলালের বাকী রহিল না, কিন্তু সে কোন মন্তব্য করিল না, অন্য দু'চার কথার পর রমলাকে লইয়া যেখানে কাল রাত্রে হেমচন্দ্রের দেহ পড়িয়াছিল সেই স্থানটি পরিক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইল।

বাগানের এক স্থানে আসিয়া রমলা সম্মুখের নরম ঘাস-যুক্ত জমির এক অংশে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিল—এই বরাবর আমি বাবার দেহ প'ড়ে থাকতে দেখি!

মোহনলাল ও সতু উভয়েই একান্ত তীক্ষ্ণ নেত্রে জমির পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল!

এক স্থানে সবুজ ঘাসের উপর রক্তের দাগ শুকাইয়া আছে··· ···পাশে আরও কয়েকটা······মোহনলাল ধীরে ধীরে এক পা এক পা করিয়া বাঁ দিকে চলিল···অদূরে গোলাপ এবং কেয়া-বাগান।

কয়েক পা যাইবার পরেই সে পায়ের নীচে আর-একটা দাগ দেখিল, সুমুখেই কেয়াগাছের ঘন ঝোপ। মোহনলাল নীচু হইয়া নরম মাটি পরীক্ষা করিল···আল্-দেওয়া জুতার ছাপ। মালীর পায়েও সেইরকম জুতা দেখা গিয়াছে। কেয়াগাছের মধ্যে কয়েকটা গাছ দুম্‌ড়াইয়া আছে! মোহনলাল সেই ঝোপের ভিতর ঢুকিয়া একস্থানে মাটির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল···নরম মৃত্তিকায় ভারী বস্তুর স্পষ্ট দাগ।

মোহনলাল বলিল—আমার মনে হয় এইখানেই ফনিলালকে হত্যা করা হয়েছে!

সাশ্চর্য্যে সতু কহিল—এইখানে! কিন্তু তার দেহ তো অন্য-স্থানে পাওয়া গেছে! সেইখানেই তো তাকে গুলি করে...

—না, সতু! আমার মনে হচ্ছে, এইখানে তাকে হত্যা ক'রে তার দেহ টেনে নিয়ে ওইখানে রাখা হয়েছে। ফনির পায়ের জুতোয় ঘাসের চিহ্ন দেখেছি, কিন্তু যেখানে তার দেহ আমরা দেখতে পাই, তার ত্রিসীমানায় ঘাস ছিল না।

কয়েক পা অগ্রসর হইয়া মোহনলাল আঙুল বাড়াইয়া বলিল—ওই দেখ! আর-একটা ভারী পায়ের ছাপ!

পদচিহ্ন লক্ষ্য করিতে করিতে উভয়ে ঝোপের পাশ দিয়া হাত দশেক পশ্চিম দিকে চলিয়া গেল...হঠাৎ একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া মোহনলাল নীচু হইয়া একটা মরশুমি-ঝাড়ের ভিতর হাত ঢুকাইয়া দিল। যখন সে হাত বাহির করিল তখন তাহার মুঠার মধ্যে একটি পিস্তল দেখা গেল।

সতু তাহার পাশে গিয়া পিস্তলটি দেখিতে লাগিল। দামী অটোমেটিক রিভল্‌বার; একটিমাত্র গুলি খরচ হইয়াছে। হাতলের উপর মালিকের নামের আদ্যক্ষর ইংরাজীতে লেখা—এইচ, এস।

ধীরে ধীরে মোহনলাল বলিল—এইচ, এস; অর্থাৎ হেমচন্দ্র সরকার।

—কি আশ্চর্য্য! সতু কহিল—তাহলে হেমবাবুই কি তাঁর মালীকে খুন করেছেন!

মোহনলাল কোন উত্তর করিল না; চিন্তিতমুখে পিস্তলটার দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার ভুরু দুইটা কুঞ্চিত! কি যেন একটা সমস্যা তাহাকে বিমূঢ় করিয়াছে।

*   *   *

কিছুক্ষণ পরে উভয়ে বাড়ীর দিকে ফিরিল। বারান্দার ধারে রমলা এবং গোপেন বোধ করি তাহাদেরই জন্য অপেক্ষা করিতেছিল; উৎসুক কণ্ঠে রমলা প্রশ্ন করিল—মোহনলাল বাবু, কিছু পেলেন নাকি দেখতে?

উত্তরে মোহনলাল তাহার কাছে আসিয়া পিস্তলটি তাহার সুমুখে স্থাপন করিয়া প্রশ্ন করিল—এ জিনিষটাকে চিন্‌তে পারেন, রমলা দেবী?

ঈষৎ শিহরিয়া রমলা বলিল—পারি বৈকি। বাবার পিস্তল। ধারে বাবার নামের আদি অক্ষর খোদাই করা আছে। কোথায় পেলেন এটা?

মোহনলাল বলিল—একটা ঝোপের পাশে।

আর কোন কথা, অর্থাৎ, মালীর এবং আর-এক অজ্ঞাত ব্যক্তির পায়ের চিহ্ন সম্বন্ধে আবিষ্কারের ব্যাপারটা সে প্রকাশ করিল না।

রমলা কহিল—তাহলে কাল রাত্রে যখন ঘর থেকে বাবা বেরিয়ে আসেন তখন হয়ত এটা নিয়েই বেরিয়েছিলেন। কিন্তু বাবার কোন খোঁজ-খবর···আপনার কি মনে হচ্ছে মোহনলাল বাবু?

—এখনই কোন কথা বলা সম্ভব নয়, রমলা দেবী; তবে রায়-সাহেব যে বিশেষ বিপদে পড়েছেন এমন আমার মনে হয় না!

কথা বলিতে বলিতে তাহারা বারান্দায় উঠিল। মোহনলাল ও সতুর আহারের ব্যবস্থা করিবার জন্য রমলা রান্নাঘরের দিকে গেল। সতু বারান্দার দেওয়ালে টাঙানো কয়েকখানা ছবি দেখিতে লাগিল। সেই অবসরে মোহনলালকে একান্তে ডাকিয়া গোপেন নিম্নকণ্ঠে বলিল—মোহনলাল বাবু, আপনাকে কয়েকটা কথা বলবার আছে। আমি রমলার কাছ থেকে আজকের মত বিদায় নিয়েচি। আপনি যদি আমার সঙ্গে একটু বেড়াতে বেড়াতে এগিয়ে আসেন তাহলে বলবার সুবিধা হবে।

কৌতূহলী-চিত্তে মোহনলাল কহিল—বেশ তো, চলুন।

কিছুক্ষণ পরে সতু পিছন হইতে বলিল—কোথায় চল্লেন আপনারা ?

মোহনলাল হাত নাড়িয়া কহিল—গোপেনবাবুকে এগিয়ে দিয়ে আসচি। তুমি কোথাও যেও না, ওইখানে থাক। আমি এখনি ফিরবো।

ইঙ্গিত বুঝিয়া সতু তাহাদের সঙ্গ লইল না।

কয়েক পা নিঃশব্দে চলিবার পর দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে গোপেন কহিল—মোহন বাবু, আমি আপনাকে যা বলব, আশা করি, আপনি তা কারুর কাছে প্রকাশ করবেন না।

মাথা নাড়িয়া মোহনলাল জবাব দিল—প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না, মিঃ রুদ্র। মালী ফনিলালকে কে হত্যা করেছে তা জানা দরকার। যদি আপনার কথায় কোন সূত্র পাওয়া যায় তাহলে সে-কথা পুলিশকে জানানো আমার কর্ত্তব্য।

তাহার কথা শুনিয়া গোপেন কিয়ৎকাল নীরবে চিন্তা করিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল—আপনার কথা অ-ন্যায্য নয়। যাই হোক, আপনাকে বলব আমার যা বক্তব্য। তারপর আপনার যা কর্ত্তব্য আপনি তা করবেন। মালী ফনিকে কে হত্যা করেছে মনে করেন ?

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় কহিল—ছেঁড়া সোনার লকেট দেখে আমার যে ভাবান্তর ঘটেছিল তা লক্ষ্য করে আপনি হয়ত সন্দেহযুক্ত হ'তে পারেন। আসলে তা নয়। লকেটটা দেখে আমি চম্‌কে উঠেছিলাম, তার কারণ, ওটা কার আমি তা জানি।

তাহার মুখের উপর পরিপূর্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া মোহনলাল প্রশ্ন করিল—কার ?

গোপেন কহিল—ওটা রায় সাহেব হেমবাবুর সোনার চেনের লকেট। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, কেন আমি চম্‌কে উঠেছিলাম। দেখে শুনে মনে হয় যেন, রায় সাহেবই মালীটাকে গুলি করেছেন। তা নাহলে তাঁর এ-ভাবে হঠাৎ নিরুদ্দিষ্ট হবার কোন মানে হয় না। তারপর, পিস্তলটা, সেটাও রায় সাহেবের !

মোহনলাল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া শুধু গোপেনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর কহিল—কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন, রায়-সাহেবের পরণে ছিল পাজামা আর ড্রেসিং গাউন ; সে-অবস্থায় সোনার চেন তাঁর অঙ্গে বা পরিচ্ছদে থাকা স্বাভাবিক নয়।

গতিরুদ্ধ করিয়া গোপেন সোচ্ছ্বাসে কহিল—কি আশ্চর্য্য ! একথাটা তো আমার একেবারেই মাথায় আসে নি। তাহলে···

—এক মিনিট ! তাহলেই যে রায় সাহেবের পক্ষে মালীটাকে গুলি করা একেবারে অসম্ভব, তা আমি বলছি না।

—তাহলে কি আপনার ধারণা···

—উপস্থিত আমার কোন ধারণাই নেই, গোপেন বাবু। মনে রাখবেন, সোনার লকেট দেখে রমলা দেবী কোন মন্তব্য করেন নি ; এমন কি সেটা যে তাঁর বাবার তাও তিনি চিনতে পারেন নি।

গোপেন বলিল—তার কারণ এই হতে পারে যে ওটা রায়-সাহেব কখনো ব্যবহার করতেন না। ওটা তাঁর লাইব্রেরী-ঘরে একটা খোলা দেরাজে প'ড়ে থাকতো। আমি দু'একবার তাঁর সঙ্গে ইতিহাস আলোচনা করবার সময়ে দেখেছিলাম, তাই আমি দেখেই চিন্‌তে পেরেছিলাম।

কথায় কথায় তাহারা সরকার-বাড়ীর এলাকা ছাড়াইয়া খানিক-দূর আসিয়াছিল। গোপেন বলিল—আর আপনাকে কষ্ট দিতে চাই না মিঃ মিত্র। আমার আবোল-তাবোল কথাগুলো যে আপনি ধৈর্য্য ধরে শুনলেন এর জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে।

করমর্দ্দন করিয়া গোপেন বিদায় লইল। একটা পথের বাঁকে দাঁড়াইয়া মোহনলাল কিছুক্ষণ তাহার গতি-পথের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর বাড়ীর সুমুখ দিকে যাইবার উদ্দেশ্যে অন্য একটি মেঠো রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইল। পথ চলিতে চলিতে সে অন্য-মনস্ক চিত্তে বিগত ঘটনাগুলি মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। 'মৃত্যু-দূতের' কাহিনীর সহিত রায় সাহেব হেমচন্দ্রের

নিরুদ্দেশের ব্যাপার এবং মালীর হত্যাকাণ্ডের রহস্য এমনভাবে জড়াইয়া গেছে যে একের সমাধান ব্যতীত অপর রহস্যের গ্রন্থিমোচন বোধ করি সম্ভব নয়।

অন্যমনস্ক থাকার দরুণ মোহনলাল অকস্মাৎ নীচু জমিতে পা দিয়া ঠোকর খাইল এবং পতন হইতে আত্মরক্ষার জন্য তাহাকে দুই হাত দিয়া মাটি ধরিতে হইল।......ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পথের ধারে একটা ভাঙ্গা দেওয়ালের আড়াল হইতে চাপা পিস্তল গর্জ্জনের সঙ্গে একটা গুলি তাহার পাশ দিয়া ছুটিয়া গেল। হোঁচট খাইয়া তাহার পায়ে আঘাত লাগিল বটে, কিন্তু গুলির আঘাত হইতে সে-যাত্রা মোহনলাল বাঁচিয়া গেল।

পাঁচ

পিস্তলের চাপা আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ হইল না! কয়েক মিনিট স্তম্ভিত ও বিহ্বলভাবে থাকিয়া মোহনলাল সোজা হইয়া দাঁড়াইল। ভাঙা দেওয়ালের পাশে কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গলের আভাস দেখা যাইতেছে। ডান পাখানা বেদনায় বিবশ। সুতরাং শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে কোন ফল হইবে না, তাছাড়া সে-কাজ যুক্তি-যুক্তও নয়। মোহনলাল ফিরিয়া দাঁড়াইল। যে গুলি করিয়াছিল সে সম্ভবত দেওয়াল বাহিয়া উপরে উঠিয়া পিস্তল চালাইয়াছিল; এতক্ষণে নীচে নামিয়া বহুদূর চলিয়া গেছে।

কিন্তু হঠাৎ সে মোহনলালকে এ-ভাবে আক্রমণ করিল কেন? তার একটিমাত্র কারণ চোখে পড়ে। অজ্ঞাত আততায়ী চাহে না যে মোহনলাল নিরুদ্দিষ্ট রায় সাহেব হেমচন্দ্রের বা মালীর হত্যা-কারীর অনুসন্ধান করে।

মোহনলাল সাবধানে অগ্রসর হইল। অনুসন্ধান তাহাকে করিতেই হইবে দ্বিগুণ উৎসাহে কঠিনতর সংকল্প লইয়া।

দুপুরে আহারাদির পর সতুকে নির্জ্জনে লইয়া মোহনলাল গোপেনের কথা এবং মাঠের ধারে অল্পের জন্য প্রাণরক্ষার কাহিনী বিবৃত করিল। অপ্রত্যাশিত আক্রমণের ব্যাপার শুনিয়া সতুর দুই চোখ কপালে উঠিল। উভয়ে বহুক্ষণ ধরিয়া সরকার-বাড়ীর রহস্য সম্বন্ধে আলোচনা করিল কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিল না। সতুর ধারণা, মালীকে খুন করিয়াছে রায় সাহেব স্বয়ং; ইচ্ছা করিয়া নয়, ভুল করিয়া; কিন্তু মোহনলালের যুক্তির কাছে তাহার ধারণা টিকিল না। মোট কথা, ইতিমধ্যেই সর্ব্বদিক হইতে রহস্য-চক্র এমনভাবে জটিল আকার ধারণ করিয়াছিল যে মোহনলাল ও সতু উভয়েই বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল।

কথায় কথায় চিন্তামগ্নভাবে মোহনলাল কহিল—এখন একটু বিশ্রাম করা দরকার। হয়ত রাত জাগতে হ'তে পারে। আমার মনে হচ্ছে, আজকের রাত বৃথা যাবে না।

চকিতস্বরে সতু কহিল—আজ রাত্রে কি হবে?

—তা জানি না। তবে 'মৃত্যু-দূত' যে আজ রাতে আমাদের দর্শন দেবে না, তা জোর ক'রে বলা যায় না।

তাহার কথা শেষ হইবার আগেই একজন ভৃত্য আসিয়া জানাইল যে কলিকাতা হইতে মোহনলালের নামে জরুরী টেলিফোন আসিয়াছে।

পাশের ঘরে গিয়া টেলিফোন তুলিয়া মোহনলাল সাড়া দিল। প্রশ্ন আসিল—কে, মিঃ মিত্র ?...আমি, ইনসপেকটার কবীর! হ্যাঁ, কলকাতার থানা থেকে বলছি।

—কি খবর বল ?

—নরহরি...হ্যাঁ, আপনি যে বিষ সম্বন্ধে আবিষ্কার ক'রে আমায় জানিয়েছিলেন...হ্যাঁ, আপনার কথামত আমি কাজ করবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু নরহরিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না...অনেক চেষ্টা হয়েছে...কোন সন্ধান নেই।

কবীরের কথা শুনিয়া কয়েক সেকেণ্ড নীরব থাকিয়া মোহনলাল বলিল—শুনলাম! তা আমি কি করতে পারি বল।

—আপনার সাহায্য চাই। আজ সকালে টেলিফোন ক'রে আমায় জানিয়েছিলেন, আপনি রায় সাহেব হেমচন্দ্র সরকারের বাড়ী যাচ্ছেন এবং কোন খবর থাকলে আপনাকে জানাতে, তাই আপনাকে বিরক্ত করলাম।

—বিরক্ত কিছু নয়। কিন্তু আমি কি করব তা তো ভেবে পাচ্ছি না। যাই হোক, আমি কাল কলকাতায় গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করব।

—ধন্যবাদ।

মোহনলাল টেলিফোন ছাড়িয়া দিল। নরহরির বিরুদ্ধে

সন্দেহের কারণ এই যে, সে বসিরহাট অঞ্চলে হাজিমল নামে এক ইহুদি জহুরির কাছে থাকার সময় হাজিমল একরাত্রে সন্দেহজনক ভাবে পিস্তলের গুলিতে মারা পড়ে। সকলে মনে করে পিস্তলের গুলিতেই হাজিমল নিহত হয় ; কিন্তু মোহনলাল প্রমাণ করে যে বিষ প্রয়োগে হাজিমলের প্রাণান্ত হয়, পিস্তল ছোঁড়া হইয়াছিল তাহার মৃত্যুর পরে। ঘটনার পরদিন নরহরি অন্য একটা বাসায় বলিয়া যায়, তারপর সে নিরুদ্দেশ। বোধ হয় সে মোহনলালের সন্দেহের আভাস পাইয়াছিল।

মোহনলাল সতুকে নরহরি সংক্রান্ত ঘটনাটি আদ্যোপান্ত বিবৃত করিল। সতু কোন মন্তব্য করিল না।

কিছুক্ষণ পরে সতু বিশ্রাম করিতে গেলে মোহনলাল একাকী রায় সাহেবের পড়ার-ঘরে ঢুকিয়া গুপ্ত-রত্ন সম্বন্ধীয় কাগজগুলা দেখিতে লাগিল। সমগ্র কাহিনীটি তাহাকে অত্যন্ত কৌতূহলী ও আকৃষ্ট করিল। রমলা যাহা বলিয়াছিল তাহা ছাড়া সে আরও কতকগুলি তথ্য পাইল, কিন্তু গুপ্ত-রত্ন যে কোথায় লুকানো আছে তাহার কোন হদিস খুঁজিয়া পাইল না।

বিকালের দিকে গোপেনের দেখা পাওয়া গেল। মোহনলাল ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিল। রমলা আসিয়া তাহাদের সহিত যোগ দিল এবং সেইখানেই টেবিল চেয়ার বিছাইয়া চা-পর্ব্ব সুরু হইল।

সতুকে দেখা গেল না। অনুসন্ধানে জানা গেল, সতু স্থানীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে বাহির হইয়াছে।

চা যখন প্রায় শেষ তখন সতু আসিল। মোহনলাল লক্ষ্য করিয়া দেখিল, তাহার চোখেমুখে চাপা উত্তেজনা।

সন্ধ্যার পর হাতমুখ ধুইয়া মোহনলাল বেশ-পরিবর্ত্তন করিতেছে এমন সময় সতু আসিয়া কহিল—খবর আছে স্যর!

—তা বুঝতে পারছি। বল, কি খবর।

—বুড়ো চাকর জয়রাম গোপনে বাড়ীর বাইরে খাবার-রুটি-তরকারী নিয়ে যায় কারুকে খাওয়াবার জন্যে।

ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া মোহনলাল বলিল—কেমন ক'রে জানলে?

—এইমাত্র, কিছুক্ষণ আগে আমি ওদিক পানে বেড়াতে বেরিয়েছি এমন সময় দেখতে পেলাম, রান্নাবাড়ীর একটা ঘরের মধ্যে একলা জয়রাম মাটিতে উবু হ'য়ে ব'সে। প্রথমটা আমি কোন সন্দেহ করি নি, কিন্তু তারপর তার আচরণ লক্ষ্য ক'রে আমার কেমন সন্দেহ হল, দেখলাম, সে কতকগুলো রুটি, তরকারী সন্দেশ, আরও সব খাবার জিনিষ, একটা কাগজের পুঁটলির মধ্যে ভরছে। হঠাৎ অন্য কোন চাকর বা বামুনের সাড়া পেয়ে সে তাড়াতাড়ি পুঁটুলিটা একটা বড় ঝুড়ির পিছনে লুকিয়ে ফেললে। তারপর অন্য কাজে চ'লে গেল। তাতে আমার সন্দেহ বাড়লো।

সতু নীরব হইলে মোহনলাল বলিল—ব্যাপারটা সন্দেহজনক বটে। খাবারগুলোর গন্তব্যস্থান জানা দরকার।

সতু বলিল—আমার মনে হয় জয়রাম তার মনিব রায় সাহেবের কাছেই খাবার নিয়ে যায়।

মোহনলাল কহিল—তাহলে রায় সাহেবের কার্য্যকলাপ জয়রাম জানে! কিন্তু রমলা জানে না।

ঘাড় নাড়িয়া সতু কহিল—হয়ত তাঁর চাকর-হত্যার ব্যাপারটা তিনি মেয়েকে জানাতে চান না।

—আমাকে মারবার চেষ্টা, সেটা কার কাজ বলে মনে কর?

—রায় সাহেবেরই। লোকটা নিশ্চয়ই কোন ভীষণ কাজে লিপ্ত হয়েছে, তাই এই লুকোচুরি আর রহস্য। 'মৃত্যুদূতের' অভিনয় হয়ত তাঁরই সৃষ্টি।

সতুর মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া মোহনলাল কহিল—তোমার কল্পনাশক্তির তারিফ করতে হয়। তোমার 'থিওরি' ফেল্না নয়—ভেবে দেখতে হবে। এখন জয়রামের ওপর নজর রাখা যাক। আমার বোধ হচ্ছে, আজ রাত্রে আমাদের আহারাদি শেষ হলে সে খাবারের পুঁটুলি নিয়ে বেরুবে। যাই হোক, ঘুরে ফিরে তুমি তার ওপর লক্ষ্য রাখো।

রাত্রে এখানে গোপেনেরও নিমন্ত্রণ ছিল। হাসি-গল্পে সন্ধ্যাটা মন্দ কাটিল না। পিতার আকস্মিক অদৃশ্য হওয়ায় মনে মনে যারপরনাই কাতর ও উদ্বিগ্ন হইলেও রমলা সাহসে মন বাঁধিয়া সকলের সঙ্গে খুসীমুখে আলাপ করিতে লাগিল।

মোহনলাল গোপেনের সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করিল। এখানে গোপেনদের দেশের বাড়ী। বাপ-মা কলিকাতায় থাকেন। সে প্রায়ই দেশের বাড়ীতে আসে। রমলার সঙ্গে তাহার বহুদিনের আলাপ। না, গোপেনের এখনো বিবাহ হয় নাই। একটি তরুণীর

সম্মতির জন্য সে অপেক্ষা করিতেছে। কে যে সেই তরুণী তাহা বুঝিতে অবশ্য মোহনলালের বিলম্ব হইল না।

রাত্রে আহারাদির পর গোপেন প্রস্থান করিল। সতু বাড়ীর মধ্যে এদিক ওদিক করিতেছে, অর্থাৎ জয়রামের গতিবিধির উপর নজর রাখিতেছে। যে-ঘরে মোহনলাল বসিয়াছিল তাহার দেওয়ালে রূপার ফ্রেমে বাঁধানো একটি তরুণীর ফটো টাঙানো ছিল। মেয়েটির মুখখানি অনিন্দ্য সুন্দর। বাঙালীর ঘরে সাধারণত এমন সুন্দর চেহারা দেখা যায় না।

মোহনলাল ছবিখানা দেখিতেছে লক্ষ্য করিয়া রমলা কহিল—ওটা কার ছবি জানেন ?

—না।

রমলা কহিল—আমার বাবার প্রথম স্ত্রীর, উনি মারা যাবার কয়েক বছর পরে বাবা আমার মাকে বিবাহ করেন।

—রায় সাহেবের দুই বিবাহ ! তা তো জানতাম না।

—কেউই বড় জানে না। বিয়ের এক বছর না দেড় বছরের মধ্যেই ইনি মারা যান। মার মুখে শুনেছিলাম, বাবা এঁকেও খুব ভালবাসতেন।

একটি নূতন খবর পাওয়া গেল। কথায় কথায় জানা গেল, প্রথমা স্ত্রীকে রায় সাহেব বিলক্ষণ ভালবাসিতেন এবং তাহা লইয়া দ্বিতীয় পত্নীর সহিত মাঝে মাঝে কলহও ঘনাইয়া উঠিত।

ঘণ্টাখানেক পরে রমলা নিজের ঘরে চলিয়া গেল। দ্বিতলের একাংশে পাশাপাশি দুইটি ছোট ঘর মোহনলাল ও সতুর জন্য নির্দিষ্ট

হইয়াছিল। একটা চাকর তাহাদের জন্য নিযুক্ত ছিল, সে বিছানা পাতিয়া মশারি ফেলিয়া দিয়া গেল। মোহনলাল নিজের ঘরে ঢুকিবার আগে চুপি চুপি সতুকে বলিল—জামা ছেড়ে আলো নিবিয়ে আমার ঘরে চলে এসো।

নিজের ঘরে ঢুকিয়া মোহনলাল পাঞ্জাবী খুলিয়া একটা হাতকাটা সার্ট পরিয়া লইল; তারপর সুটকেশের ভিতর হইতে খানিকটা সরু রেশমের বাণ্ডিল বাহির করিল। প্রকৃতপক্ষে রেশমের বাণ্ডিলটি একটি দড়ির মই। মোহনলাল তাহা সাবাধানে খুলিয়া ঘরের বাহিরে বারান্দার পিল্‌পায় বাঁধিল। ঘরের জানলায় গরাদ দেওয়া; বারান্দা দিয়াই নীচে নামিতে হইবে। সতু এ ঘরে আসিলে মোহনলাল তাহাকে জানাইল যে, সকলের অলক্ষ্যে নীচে নামিয়া জয়রামের গতিবিধি দেখিতে হইবে। এখনো চাকরদের আহার শেষ হয় নাই, সুতরাং আহার্য্য লইয়া জয়রামের বাহির হইতে এখনো দেরী আছে। অ্যাড্‌ভেঞ্চারের উত্তেজনায় সতু চঞ্চল হইয়া উঠিল। মোহনলাল তাহার ঘরের আলো নিবাইয়া দিয়া বলিল—কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। তাহলে মনে হবে যে আমরা ঘুমিয়ে গেছি। তুমি বরঞ্চ একটু শুয়ে নাও।

সতু মোহনলালের বিছানায় শুইয়া পড়িল। সারাদিন ঘোরাঘুরির জন্য সে বোধ করি ক্লান্ত হইয়াছিল, শয়নের সঙ্গে সঙ্গে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইল। মোহনলাল তাহার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিল। সতু ততক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

জানলার কাছে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া মোহনলাল

বসিল। চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ। গাছের মাথায় অসংখ্য জোনাকির দীপ্তি আর ঝিঝিঁর ডাক। চাকরগুলার সাড়া শব্দ পাওয়া যাইতেছে না। তাহারা বোধ করি তাহাদের 'কোয়ার্টার্সে' চলিয়া গেছে। এইবার হয়ত জয়রাম বাহির হইবে।

কাহার জন্য সে আহার্য্য লইয়া যাইবে?

হয়ত একটু তন্দ্রার ভাব আসিয়াছিল, ঘাড়টি একপার্শে হেলিয়া পড়িয়াছে, মোহনলাল অকস্মাৎ চমকিয়া জাগিয়া উঠিল...একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার গভীর স্তব্ধতা ভেদ করিয়া তাহাকে যেন ধাক্কা দিয়া দাঁড় করাইয়া দিল...স্ত্রীলোকের আর্ত্ত কণ্ঠস্বর—মোহনলালবাবু...

ছয়

বিদ্যুৎ গতিতে চেয়ার হইতে উঠিয়া মোহনলাল অন্ধকার বারান্দায় ছুটিয়া গেল। রমলার ঘর বারান্দার আর এক প্রান্তে, পশ্চিম দিকের কোনে। মোহনলাল লক্ষ্য করিয়া বারান্দার আলো জ্বালিয়া দিল, তারপর তীর বেগে রমলার ঘরের দিকে ছুটিল...

দরজা বন্ধ।...মোহনলাল দুইচারবার দরজায় ধাক্কা দিল; তারপর এক পা পিছাইয়া গিয়া সজোরে দ্বারের উপর লাথি মারিল। তিনবারের বার ভিতর হইতে খিল ভাঙিয়া পড়িল, সশব্দে দরজা খুলিয়া গেল।

ভিতরে নীল মৃদু জ্বলিতেছে। রমলা বিছানার উপর বসিয়া

আছে। ঠাহর করিয়া সুইচ টিপিয়া মোহনলাল বড় আলো জ্বালিয়া দিয়া দেখিল, রমলা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে, দুই চোখ আতঙ্কে পাণ্ডুর! কম্পিত হাতে সে নিজের গলা ধরিয়া আছে।

—কি হয়েছে, রমলা দেবী?

রমলা কথা বলিতে পারিল না। হাত দিয়া জানলা দেখাইয়া দিল। জানলার বাহিরে ছোট ছাদ; এ জানলায় গরাদ লাগানো ছিল না। জান্‌লা দিয়া ছাদে গিয়া মোহনলাল নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সবিস্ময়ে দেখিল, অস্ফুট চন্দ্রালোকে বাগানের মধ্যে একটি পলায়মান ছায়া!—"মৃত্যুদূত।"

তীরবেগে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া মোহনলাল বাগানের দিকে ছুটিল। 'ভূত'-টাকে সাম্‌না-সামনি পাইলে এ-রহস্য হয়ত আজই সমাধান লাভ করিবে!

পলায়নরত মূর্ত্তিটা মোহনলালের সাড়া পাইয়াছিল। অন্ধকারের ভিতর হইতে অকস্মাৎ পিস্তল গর্জ্জিল! মোহনলাল চকিত হইয়া একটা গাছের আড়ালে লুকাইল।

এ অবস্থায় অনুসরণ করা সমীচীন নয়। তাছাড়া লোকটা এতক্ষণে নাগালের বাহিরে চলিয়া গেছে। অন্ধকারে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা মূঢ়তা। মোহনলাল প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

রমলার আর্ত্তস্বরে, তারপর পিস্তল গর্জ্জনের শব্দে, দাসী-চাকরের দল জাগিয়া উঠিয়া মনিব-কন্যার ঘরে আসিয়া জুটিয়াছিল। সতুও আসিয়াছিল।

রমলা একটু সুস্থ হইলে মোহনলাল বলিল—এইবার বলুন তো রমলা দেবী, কি হয়েছিল ?

ক্ষীণস্বরে রমলা বলিল—একটা কিম্ভুতকিমাকার মানুষ···আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ আমার মুখের ওপর কি একটা পড়তেই আমি জেগে উঠে দেখি, একটা কিম্ভুতকিমাকার মানুষ আমার দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে, আর আমার মুখের ওপর একটা কাপড় চেপে ধরেছে। আমি হাত দিয়ে কাপড়টা সরিয়ে চেঁচিয়ে উঠি। ওই যে কাপড়টা···আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল।

কাপড়ের টুকরাটা তুলিয়া নাকের কাছে ধরিয়া মোহনলাল কহিল—ক্লোরোফর্ম্ !

সতু কহিল—বাগানে কারুকে দেখ্‌লেন নাকি ?

—দেখেছি বৈকি ! 'মৃত্যুদূত' আজো এসেছিলেন এবং দূর থেকে পিস্তল ছুঁড়ে আমায় সাবধান ক'রে দিয়ে গেলেন।

রমলা কহিল—এ সব কি ব্যাপার, মোহনলালবাবু ?

—তাই তো আমাদের জানতে হবে, রমলা দেবী। যাই হোক, আপনি বিশ্রাম করুন। নিস্তারিণী আপনার কাছে থাকুক। আজ রাত্রে আর কোন ভয় নেই। আমরাও সজাগ থাকবো।

রাত্রের মতো সকলেই যে যার ঘরে গেল বটে, কিন্তু কেহই ঘুমাইতে পারিল না।

* * *

ভোরবেলা শয্যাত্যাগ করিয়া হাতমুখ ধুইয়া মোহনলাল নীচে

নামিয়া আসিল। তাহাকে নামিতে দেখিয়া ইদু খানসামা চা দিয়া গেল। বারান্দায় একাকী বসিয়া মোহনলাল চা পান করিল।

নানা চিন্তায় তাহার মন আলোড়িত। রমলার প্রতি আক্রমণের ঘটনাটি একান্ত অপ্রত্যাশিত। 'মৃত্যুদূতের' আবির্ভাব হয়ত অকারণ এবং অসম্ভবের কোঠায় পড়ে না ; কিন্তু রমলার প্রতি তাহার এরূপ আচরণের অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া রীতিমত দুষ্কর। স্পষ্টই বোঝা যায়, রমলাকে অজ্ঞান করিয়া তাহাকে অপহরণ করাই উদ্দেশ্য ছিল।

মনে মনে নানা আলোচনা করিয়া মোহনলাল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে, সমস্ত ব্যাপারের অন্তরালে আছে রায় সাহেবের আবিষ্কৃত গুপ্ত-রত্নের রহস্য! রমলা ব্যতীত রায় সাহেবের কার্য্য-কলাপ আর কার জানা আছে? সম্ভবত এ-খবর বাড়ীর দাসী-চাকরগুলা সকলেই জানে। তাহাদের মধ্যে কেহ কি সন্দেহের পাত্র? জয়রাম?

পিছনে পদশব্দ শুনিয়া ঘাড় ফিরাইয়া মোহনলাল বলিল— এসো। তোমারই জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

সতু একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া কহিল—ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আপনি কি সারা রাত জেগেই কাটালেন?

সে-প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া মোহনলাল বলিল—আজকের কাজের কথা বলি শোন। আমি একবার কলকাতা যাব। ইনসপেকটার কবীরের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তুমি চারিদিকে

চোখ রেখে চলবে। অনর্থক যাতে কোন বিপদ না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখবে আর নজর রাখবে জয়রামের ওপর। খাবারগুলো কোথায় যায় তা জানা বিশেষ দরকার। আমার বিশ্বাস, কাল রাতে সে খাবার নিয়ে বেরুতে পারে নি। তাই আজ সুযোগ পেলেই বেরুবে।

তারপর উভয়ের মধ্যে আরও নানা কথার আলোচনা হইল। সতু কহিল—তাহলে আপনার বিশ্বাস, গুপ্তরত্নের রহস্যই এসমস্তের মূল ?

—আমার তো তাই মনে হচ্ছে। তবে আমার ভুলও হ'তে পারে! দেখা যাক। আর-একটা কথা। কোন কারণেই রমলা যেন বাড়ী ছেড়ে বাগানের মধ্যে বা বাগানের বাইরে না যায়। এ-বিষয়ে খুব সাবধান। রমলাকে বোলো, বিশেষ কাজে আমায় কলকাতা যেতে হচ্ছে; কাজ শেষ হলেই ফিরবো।

* * *

মোহনলাল প্রস্থান করিবার পর সতু উদ্দেশ্যহীন-ভাবে এ-ধার ও-ধার ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাত্রের ঘটনায় রমলার শরীর খারাপ হইয়াছিল বলিয়া সে নীচে নামিল না, উপরেই রহিল।

কিছুক্ষণ পরে গোপেনের সাড়া পাওয়া গেল।—'এরা সব কোথায়?' বলিতে বলিতে বারান্দায় উঠিয়া সতুকে দেখিয়া কহিল—এই যে আপনি রয়েছেন।

—আসুন। বলিয়া সতু তাহাকে অভ্যর্থনা করিল।

গোপেন কহিল—কাল সারা রাত ঘুমুতে পারি নি মশায়।

এ-বাড়ীর ব্যাপার বড্ডই বিচলিত করেছে আমাকে। তাই সকাল বেলাই চলে এলাম।

সতু তাহার মুখের পানে তাকাইল। গোপেনের চোখমুখ শুষ্ক বিবর্ণ, চোখের নীচে কালো রেখা! মনে মনে সতু ভাবিল— এ ভদ্রলোকের এতখানি উদ্বেগ তো স্বাভাবিক নয়।

ধীরে ধীরে সে গত রাত্রের ঘটনার কথা বলিল। শুনিয়া গোপেন সজোরে বলিল—কিন্তু এ যে ভয়ানক ব্যাপার! রমলাকে চুরী ক'রে নিয়ে যাবার চেষ্টা! কিন্তু কেন? কি উদ্দেশ্য? এ-বিষয়ে মোহনবাবু কি বলেন?

—তিনি এখনো কোন মতামত দেন নি। প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত তিনি কিছু বলবেন না।

—যাই, দেখি, মিস সরকার কেন আছেন। বলিয়া গোপেন বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

সতুর ললাটে চিন্তার রেখা ফুটিল; গোপেনের আচরণে এবং কথায় যেন একটা অস্বাভাবিক ব্যগ্র ব্যস্ত ভাব, মনে হয় যেন, রাত্রিবেলাকার কোন কিছু ঘটনা শুনিবার জন্যই সে এত সকালে এখানে আসিয়াছে! সতু বারান্দা হইতে বাগানে নামিয়া পায়চারি করিতে লাগিল।

বাগানের একস্থান হইতে রান্নাবাড়ী চোখে পড়ে। ঘুরিতে ঘুরিতে সেদিকে নজর পড়িতেই তাহার গতি রুদ্ধ হইল। জান্‌লার ফাঁক দিয়া জয়রামকে দেখা যাইতেছে। সন্ত্রস্তভাবে কি একটা জিনিষ সে গায়ের ভিতর লুকাইতেছে! খাবারের পুলিন্দা। বিস্মিত

সতু ভাবিল, দিনের বেলায় প্রকাশ্যভাবেই সে খাবার লইয়া যাইবে নাকি ?

আশ্চর্য্য নয়। কাল রাত্রে হয়ত যাইতে পারে নাই, তাই আজ সকালেই যাইবে। সতু মুহূর্ত্তে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল।

*　　　　*　　　　*

এদিকে রান্নাবাড়ী হইতে বাহির হইয়া এদিক ওদিক চাহিয়া জয়রাম পশ্চিম দিকের গেট ঠেলিয়া বাগানের পোড়ো জমির দিকে চলিল। অনেকখানি জমি পার হইয়া একটা উঁচু ঢিবি অতিক্রম করিয়া সে একটা মেঠো রাস্তায় নামিল। রাস্তায় নামিয়া আর-একবার পিছন দিকে চাহিল। কেহ কোথাও নাই। তখন জয়রাম নিশ্চিন্ত মনে অগ্রসর হইল।

কিছু দূরে একটা মুদীর দোকান। জয়রাম সেখানে দাঁড়াইয়া দু'একটা জিনিস কিনিল। তারপর গ্রামের ডাকঘরে ঢুকিল।

ডাকঘর হইতে বাহির হইয়া রাস্তা দিয়া অগ্রসর না হইয়া সে বনের মধ্যে ঢুকিল। এ-স্থানে কোন লোকালয় নাই। চারিদিকে বিস্তীর্ণ জঙ্গল। বনের পিছনে তিন-চার তলা উঁচু একটা চুনা-পাথরের খাড়াই। স্থানটা যেমন দুর্গম তেমনি নোংরা। জঙ্গলে প্রবেশ করিবার আগে জয়রাম বার বার চারিদিক দেখিয়া লইল।

এতক্ষণ সতু অতি কষ্টে আত্মগোপন করিয়া জয়রামকে অনুসরণ করিতেছিল। এইবার বিপদে পড়িল। বনের মধ্যে তাহার

পিছু নেওয়া সহজসাধ্য নয়—যে কোন মুহূর্ত্তে ধরা পড়িতে পারে এবং ধরা পড়িলেই সকল শ্রম পণ্ড! যাই হোক, এত দূর যখন আসিয়াছে তখন শেষ পর্য্যন্ত দেখিতেই হইবে। সতু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া জুতা খুলিয়া হাতে লইল; তারপর অন্য ধার দিয়া বনের মধ্যে ঢুকিল।

অদূরে জয়রামের পদশব্দ! সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া নিঃশব্দ-পদক্ষেপে সতু অগ্রসর হইল।

পায়ের শব্দ থামিয়াছে। সতু একটা গাছের আড়ালে গুড়ি মারিয়া বসিয়া গাছের ফাঁক দিয়া দেখিল, অদূরে জয়রাম দাঁড়াইয়া। তাহার সামনে একটা ভাঙা হেলিয়া-পড়া জীর্ণ কুঁড়ে ঘর। জয়রাম সেই ঘরের দরজার উপর করাঘাত করিল।

সতুর বক্ষস্পন্দন যেন থামিয়া গেল। উত্তেজনায় কাণ দুইটা গরম হইয়া উঠিয়াছে! ঘর হইতে কে বাহির হইবে? সে কি রায় সাহেব স্বয়ং?

কিন্তু কেহ বাহির হইল না, শুধু ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ শব্দে দরজাটা ঈষৎ উন্মুক্ত হইল। জয়রাম কুঁড়ের মধ্যে ঢুকিয়া গেল।

ঘরের মধ্যে কে আছে দেখিতে হইবে। সতু গুড়ি মারিয়া কিছু দূর আগাইয়া গেল। আশসেওড়া, কেয়াফুল আর ফনি-মনসা, তা'ছাড়া অসংখ্য প্রকারের বন্যগাছের জঙ্গলে স্থানটা যেন ঘন-রাত্রির অন্ধকারে ঝিমাইতেছে! সেই অন্ধকার সতুকে বিশেষ সাহায্য করিল, কারণ কিছু পরেই যখন জয়রাম ঘর হইতে বাহির

হইল তখন সতু মাত্র হাত দশেক দূরে; আলো থাকিলে সে জয়রামের নজরে পড়িয়া যাইত নিশ্চয়।

দরজার বাহিরে আসিয়া প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে জয়রাম ভিতর দিকে মুখ বাড়াইয়া কহিল—কাল সন্ধ্যার পর আসবো।

ভিতর হইতে সাড়া আসিল—আচ্ছা।

জয়রাম চলিয়া গেল। দূর হইতে দূরান্তরে তাহার পদশব্দ মিলাইয়া গেল। সতু উঠিয়া দাঁড়াইল। ভিতরে কে আছে তাহা না দেখিয়া ফেরা যাইতে পারে না।

কুঁড়ে ঘরের পিছনে মাটি ধ্বসিয়া ছোট ছোট ফাঁক রহিয়াছে। নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া নিঃশব্দে সতু ঘরের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

দেওয়ালের ফাঁকে চক্ষু স্থাপন করিয়া সে দেখিল, ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। এক কোনে একটা বাতি জ্বলিতেছে এবং সেই বাতির আলোর সম্মুখে বসিয়া একটা লোক গোগ্রাসে গিলিতেছে। লোকটার মুখের উপর সতু তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি স্থাপন করিল। অত্যন্ত নোংরা ছেঁড়া কাপড় পরা, খোঁচা খোচা দাড়ি-ওয়ালা ভিখারী-জাতীয় এক অজ্ঞাত অপরিচিত ব্যক্তি!

সাত

মুখ-হাত ধুইয়া ওভালটিন পান করিয়া রমলা অনেকখানি সুস্থ বোধ করিল। দিনের প্রখর আলোয় তাহার মনের ভয়

অন্তর্হিত হইল। যদিও সেই বামনাকৃতি দৈত্যের স্মৃতি একেবারে মুছিয়া যায় নাই, তাহা হইলেও এখন আর তাহার রাতের মত বিষম ভয় করিতেছে না!

বেশ-বিন্যাস করিয়া রমলা নীচে নামিল। দাই নিস্তারিণী নিজের কাজে চলিয়া গেল।

নীচে নামিয়া কাহাকেও না দেখিয়া সে কিছু বিস্মিত হইল। খবর লইয়া জানিল, মোহনলাল অনেক আগেই চলিয়া গেছে। সতু বোধ হয় বেড়াইতে বাহির হইয়াছে।

রমলা জয়রামকে ডাকিল। কিন্তু তাহাকেও পাওয়া গেল না। সে বোধ হয় বাজারে গেছে।

রমলা এধার ওধার বেড়াইতে লাগিল। ইদু খানসামা জানাইল, গোপেন বাবু আসিয়াছিলেন, কিন্তু তখন রমলা প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতেছিল বলিয়া দেখা হয় নাই, চলিয়া গেছেন, বিকালে আবার আসিবেন।

রমলা কিছুক্ষণ ইদুর সঙ্গে কথা বলিল। তারপর গোলাপ-বাগানে প্রবেশ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। এটি তাহার নিত্যকার অভ্যাস।

কিছুক্ষণ পরে একজন চাকর আসিয়া জানাইল, টেলিফোন আসিয়াছে, গোপেন বাবু টেলিফোনে তাহাকে ডাকিতেছেন।

রমলা তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়া টেলিফোন ধরিল।

—কে? গোপেন বাবু?

উত্তেজিত চাপা স্বরে জবাব আসিল—হ্যাঁ, আমি গোপেন। শোন, তুমি আমার বাড়ীতে চ'লে এসো এখুনি।

—কেন ? কি হয়েছে ?

—রায় সাহেবের দেখা পেয়েছি !···শোন, এখন কারুর কাছে ঘুনাক্ষরে কোন কথা প্রকাশ কোরো না। তাতে তাঁর ভয়ানক ক্ষতি হবে। তিনিই ফনিলালকে গুলি করেছিলেন।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময় ! কাতর কণ্ঠে রমলা বলিল—কিন্তু কেন ?

—সে-কথা বলবার জো নেই। তুমি আমার বাড়ীতে এলেই সব কথা জানতে পারবে। কাউকে বোলো না যে এখানে আসচো। চওড়া রাস্তা না ধ'রে মাঠের ধার দিয়ে চলে এসো চট্‌পট করে।

—আমি এখুনি যাচ্ছি।

রিসিভার রাখিয়া রমলা কোনদিকে না চাহিয়া, কারুকে কিছু না বলিয়া বাগানের মধ্যে নামিল। একধারে ছিল একটা ছোট গেট। সেদিকে লোকের আনাগোনা নাই। রমলা সেই গেট দিয়া বাহির হইল।

তাহার মাথার মধ্যে যেন ঘূর্ণিঝড় সুরু হইয়াছে। গোপেন তাহার পিতাকে খুঁজিয়া পাইয়াছে, এবং আশ্চর্য্য ব্যাপার, তাহার বাবা খুন করিয়াছে ফনিকে !

সিধা রাস্তায় না গিয়া পথ সংক্ষেপ করিবার জন্য রমলা বনের মধ্যে ঢুকিল। এই বনের ওপারে গোপেনের বাড়ী ! রমলা দ্রুতপদে

চলিল। এ-অঞ্চলে লোকজন একেবারেই আনাগোনা করে না। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস, এই স্থানে এবং চুনা-পাথরের ঢিবির চারি পাশের জঙ্গলে একাধিক অপদেবতার বাসা! তাহারা এ-তল্লাটের নামকরণ করিয়াছে—হানা-বন। রমলা ভূত-প্রেত বিশ্বাস করে না, তাই হানা-বনের ভিতর ঢুকিতে সে শঙ্কিত হয় নাই।

চলিতে চলিতে একস্থানে আসিয়া হঠাৎ সে চমকিয়া উঠিল। ওকি! ঝোপের আড়াল হইতে কালো-আচ্ছাদনে আবৃত একটা মূর্ত্তি তাহার সম্মুখে আসিয়া পথরোধ করিল। মূর্ত্তির মুখ দেখা যাইতেছে না; কাঁধের উপর যেখানে মুণ্ড থাকিবার কথা, সেখানে শুধু একটা সাদা রেখা! রমলার মাথা ঘুরিয়া গেল। সে চিৎকার করিবার চেষ্টা করিল; পারিল না, একখানা কঠিন হাত তাহার মুখের উপর চাপিয়া বসিল! বিকৃত কণ্ঠে মূর্ত্তিটা কহিল—হেঁ হেঁ হঁ! সহজেই তোমাকে পেয়েছি! ছাড়চি না তোমাকে আর। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ! এখান থেকে আর বেঁচে ফিরতে হবে না···হেঁ হেঁ হেঁ!

অপার্থিব অদ্ভুত গলার স্বর! রমলার মনে হইতে লাগিল যেন মূর্ত্তিটা ক্রমশঃ দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইতেছে···তাহার মাথাটা যেন আকাশে ঠেকিল···হাতদুইটা যেন দুই প্রকাণ্ড শালগাছ···সেই হাত দিয়া সে রমলাকে ধরিয়াছে···

আট

ধীরে ধীরে সতু বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। কিছুক্ষণ পরে সরকার-বাড়ীতে পৌছিয়া সে প্রথমেই জয়রামকে দেখিতে পাইল। সেলাম করিয়া ভৃত্য বলিল—হুজুর বুঝি বেড়াতে বেরিয়েছিলেন ?

—হ্যাঁ। মিস্ সরকার নীচে নেমেছেন ?

জয়রাম বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনিও বোধ হয় বেড়াতে বেরিয়েছেন।

রমলা বেড়াইতে বাহির হইয়াছে! মোহনলালের নিষেধ বাণী সতুর মনে পড়িল; কোনক্রমেই যেন রমলাকে বাড়ীর বাহিরে যাইতে দেওয়া না হয়!

—কোথায় গেছে তুমি জান ?

জয়রাম জবাব দিল—আজ্ঞে না; আমি তাঁকে বেরুতে দেখি নি। ঝির মুখে শুনলাম, গোপেনবাবু তাঁকে টেলিফোন করেছিলেন। বোধ হয় তাঁর ওখানেই গেছেন।

তাহা হইলে আশঙ্কার কারণ নাই। সতু আর-একবার চায়ের হুকুম দিয়া লাইব্রেরী-ঘরে ঢুকিল।

মিনিট পাঁচেক পরে বাহিরে গোপেনের কথা শোনা গেল—কোথায় গেলেন সতু বাবু ?

—এই যে, এখানে। আবার ফিরে এলেন যে ?

উত্তরে গোপেন কহিল—এই দিক দিয়ে ফিরছিলাম, তাই আবার ঢুক্‌লাম। মোহনলাল বাবু ফিরেছেন নাকি ?

সতু জবাব দিল—না, এখনো ফেরেন নি। রমলা দেবী কখন ফিরবেন ?

তাহার কথার উত্তরে গোপেন চোখ তুলিয়া কহিল—রমলা ফিরবে মানে ? কোথায় গেছে সে ?

সতু তাহার কাছে আসিয়া বলিল—আপনার বাড়ী গেছেন। আপনিই তো টেলিফোন করে…

—টেলিফোন ? আমি ! কি বলছেন সতু বাবু !

—আপনি টেলিফোন করেন নি ?

—না। নিশ্চয়ই না।

—জয়রাম বললে, আপনার টেলিফোন পেয়ে তিনি আপনার বাড়ী গেছেন।

জয়রামকে ডাকা হইল। জয়রাম ঝি-কে ডাকিল। জানা গেল টেলিফোনের ব্যাপার মিথ্যা নহে।

ঝি আর জয়রাম প্রস্থান করিলে গোপেন বলিল—শুনুন সতু বাবু! ঈশ্বরের শপথ, আমি টেলিফোন করি নি।

—সর্ব্বনাশ ! সতু কহিল—তাহলে তাঁকে বাড়ী থেকে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

বলিতে বলিতে সতু দ্রুতপদে বাগানে নামিল।

—কোথায় যাচ্ছেন ?

গোপেনের প্রশ্নের উত্তরে সতু কহিল—আপনার বাড়ী যেতে গেলে, সবচেয়ে তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে কোন্ পথ দিয়ে ?

—তাহ'লে এই দিকে আসুন। ঝাউবনের ভিতর দিয়ে পথ আছে।

উত্তেজিত ও কম্পিত অন্তরে উভয়ে প্রায় ছুটিতে ছুটিতে বাগান পার হইয়া বনের পথ ধরিল। এ-সব অঞ্চলে লোক চলাচল নাই। গাছের তলায় অন্ধকার জমাট বাঁধিয়াছে। গোপেন জোরে জোরে কথা বলিতেছিল, সতু তাহাকে থামাইয়া দিল—আস্তে কথা বলুন, গোপেন বাবু! আর, চারিদিকে চেয়ে পথ চলুন।

বনতলের মাঝামাঝি আসিয়া একটা ফাঁকা জায়গা দেখিয়া সতু দাঁড়াইল।

—আপনার বাড়ী কোন্ দিকে ?

—ওই যে গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে।

—এদিকটা কোথায় গিয়ে মিশেছে ?

গোপেন বলিল—এদিকে জঙ্গল আরো ঘন হ'য়ে বেড়ে গেছে। এর পিছনে আছে চুনাপাথরের পাহাড়। একটু দূরেই একটা গভীর খাদ আছে।

হঠাৎ একটা অস্পষ্ট শব্দ করিয়া, কয়েক পা ছুটিয়া গিয়া সতু নীচু হইয়া মাটি হইতে কি কুড়াইয়া লইল।

—কি পেলেন ?

সতুর হাতে একটি ছোট সোনার ব্রোচ্! দেখিয়াই গোপেন কহিল—রমলার!

যেখানে ব্রোচ্‌টি পড়িয়াছিল, সতু সেইখানকার মাটির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া কি যেন দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল।

মাটির উপর কালো কালো ভিজা দাগ। সতু নীচু হইয়া একটি বড় দাগের উপর আঙুলের চাপ দিল। যখন সে পুনরায় সোজা হইয়া দাঁড়াইল তখন তাহার আঙুলে তাজা রক্তের ছাপ!

নয়

অতর্কিতে শত্রু-হস্তে পড়িয়া রমলা যেন হতচেতন হইয়া পড়িয়াছিল! হঠাৎ একি হইল! এ কোন্‌ দানবের হাতে সে পড়িল!

—হুঁ! মূর্চ্ছা গেছে!···তাহলে কাঁধে ক'রেই নিয়ে যেতে হবে।

এই বলিয়া লোকটা রমলাকে মাটির উপর রাখিল।

এই সুযোগ! যা থাকে কপালে, এ সুযোগ ছাড়া হইবে না। রমলা মনে মনে সাহস সঞ্চয় করিয়া দুই হাত শক্ত করিল।

লোকটা তখন তাহার দিকে পিছন করিয়া নিজের মুখোস এবং পোষাক ঠিক করিয়া গুছাইয়া পরিতেছিল; সেই অবসরে রমলা উঠিয়া দাঁড়াইল। চুড়ির শব্দে মূর্ত্তিটা ঘুরিয়া দাঁড়াইতেই, রমলা দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ধাঁ করিয়া তাহার নাকের উপর সজোরে চুড়ি-সমেত ডানহাতখানা ছুঁড়িয়া মারিল।

একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে নাকের উপর আঘাত পাইয়া আততায়ী কিছুক্ষণের জন্য বিমূঢ় হইয়া গেল। সেই অবকাশে রমলা প্রাণপণে দৌড় দিল। কোন্ দিকে সে যাইতেছে সে জ্ঞান তাহার নাই; শুধু, ওই ভীষণ-দর্শন রাক্ষসটার নিকট হইতে যত দূরে যাওয়া যায়···গাছের ডালপালায় আঘাত খাইতে খাইতে কাতর আর্ত্ত রমলা ছুটিতে লাগিল···

পিছনে পদশব্দ···দৈত্যটা তাহার পিছু লইয়াছে···এখনি তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে···তাহার সহিত, নারী সে, ছুটিয়া পারিবে কেন···রমলার পা দুইটা ভারী হইয়া আসিতে লাগিল···তাহার দুই চোখে ঘন অন্ধকার···মাথার ভিতর ঝিমঝিম করিতেছে···

কর্কশস্বরে পিছন হইতে লোকটা কি বলিল, তাহা তাহার কানে প্রবেশ করিল না···গাছপালা কমিয়া আসিয়াছে···ফাঁকা জমি··· হঠাৎ রমলা 'আঁ' করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল···তাহার পা দুইটা মাটি ছাড়িয়া শূন্যে পড়িল···সঙ্গে সঙ্গে ঠিক্‌রাইয়া সে একেবারে অতল খাদের মধ্যে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল···

* * *

রক্ত দেখিয়া গোপেনের মুখ পাংশু হইয়া গেল। ক্ষীণ কণ্ঠে সে বলিল—যে-লোকটা আমার নাম ক'রে ভুলিয়ে এনেছে তার পায়ের ছাপও দেখা যাচ্ছে, সতু বাবু!

—দেখেছি আমি!

—কিন্তু রক্ত···রক্ত কেন?

গোপেনের কথার কোন জবাব না দিয়া সতু পায়ের চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

—এই রমলার সরু-হিল জুতোর ছাপ। গাছের ডালপালা সরানো···এইখানে কিছু একটা হয়েছে···এগিয়ে যাওয়া যাক··· এই যে, এই দিক দিয়েই দু'জনে গেছে···

উভয়ে সম্মুখের দিকে চলিল। ক্ষণকাল পরে গোপেন বলিল —এইবার হুঁসিয়ার! এই গাছগুলোর পরেই সেই খাদ!

—কিন্তু রমলার জুতোর ছাপ তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

বলিতে বলিতে সতু খাদের কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইল— সর্ব্বনাশ!

—অ্যাঁ···তাহলে কি···

—চুপ! ওই শুনুন।

ক্ষীণ আর্ত্তস্বর···খাদের ভিতর হইতে আসিতেছে···রমণীর কণ্ঠস্বর।

তুইজনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নীচের দিকে চাহিল। কয়েকটা গাছের মধ্যে একটী স্ত্রীলোকের অস্পষ্ট দেহের রেখা!

গোপেন হাঁকিল—রমলা!

উত্তরে নারী কি বলিল, বোঝা গেল না।

গোপেন বলিল—আমি নেমে যাই, সতু বাবু।

—পারবেন তো?

ঘাড় নাড়িয়া জামাটা খুলিয়া ফেলিয়া গোপেন কহিল— পারবো! ছেলেবেলায় এই খাদে নামাই ছিল আমাদের প্রতি-

দুপুরের দুঃসাহসিক কাজ···অভ্যাস আছে, তাছাড়া হদিসও জানি।

বলিতে বলিতে গোপেন পা দুইটা ঝুলাইয়া পিছন ফিরিয়া সন্তর্পনে নামিতে লাগিল।

কয়েকটা গাছের গুঁড়িতে আটক খাইয়া রমলা সে-যাত্রা প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছিল; যেরূপ বেগে সে গড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাতে এই ভাবে বাধা না পাইলে, নীচেকার বড় বড় পাথরে ধাক্কা খাইয়া তাহার দেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইত।

—রমলা!

ক্ষীণ স্বরে রমলা সাড়া দিল! কোমরে রীতিমত আঘাত লাগিয়াছে! গোপেন তাহার নিকটে গিয়া তাহাকে তুলিয়া নিজের পাশে বসাইল। গোপেনকে দেখিয়া রমলার মুখে যে আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল তাহা বর্ণনাতীত; তাহার কাঁধে মাথা রাখিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল—বাঁচলাম!

—কি ক'রে পড়লে?

—'মৃত্যুদূত'···বনের মধ্যে আমায় ধরেছিল। তোমার নাম ক'রে আমায় ডেকেছিল টেলিফোনে।

—আচ্ছা, সে-সব শুনবো পরে। এখন চল, ওঠা যাক। ওপরে সতু বাবু আছেন।

তখন উভয়ে উভয়ের হাত এবং কোমর ধরাধরি করিয়া অতি কষ্টে, অনেক বিলম্বে খাদ হইতে উপরে উঠিয়া আসিল।

দশ

কলিকাতা হইতে মোহনলাল নিজের মোটরে ফিরিল। সতুর মুখে, জয়রামের খাবার জোগান দেওয়া এবং রমলার প্রতি দ্বিতীয় আক্রমণের কাহিনী শুনিয়া সে বিশেষ কোন মন্তব্য করিল না।

সতু কহিল—বনের মধ্যে ভিখিরীর মত যে লোকটাকে জয়রাম খাবার দিয়ে এলো সেই কি 'মৃত্যুদূত' ?

—না। এ অন্য লোক। তুমি ঠিক করে দেখেছো তো, রায় সাহেব নয় ?

—নিশ্চয় না। এ একটা ভবঘুরে নোংরা লোক।

বিকাল বেলা রমলার সহিত কথাপ্রসঙ্গে মোহনলাল তাহাকে একটি প্রশ্ন করিল, কহিল—মিস সরকার, বলতে পারেন, রায় সাহেবের প্রথম বিবাহের সময় তাঁর প্রথম স্ত্রীর আত্মীয় স্বজন কারা জীবিত ছিলেন ?

একটু চিন্তা করিয়া রমলা জবাব দিল—আমি যতদূর জানি, আমার সৎমায়ের বাবা মা কেউ ছিলেন না ; শুনেছিলাম, এক ভাই ছিল শুধু !

মোহনলাল জিজ্ঞাসা করিল—সেই ভাই এখন কোথায় আছে, জানেন ?

মাথা নাড়িয়া রমলা কহিল—একদম না ! বেঁচে আছেন কি না তাও জানি না। বাবা তাঁর প্রথম বিবাহ সম্বন্ধে বিশেষ কোন

কথাই বলতেন না, আমিও বড় একটা জিজ্ঞাসা করতাম না; দু'একবার দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করেছি।

—আর-একটা কথা। আপনার সৎমায়ের বাবার কি পদবী ছিল জানেন কি ?

—জানি। আগস্তি। নামটা মনে পড়ছে না। সৎমায়ের নাম ছিল মৃণালিনী। আগ্রায় বাবা তাঁকে প্রথম দেখেন...

বলিতে বলিতে হঠাৎ থামিয়া সবিস্ময়ে রমলা কহিল—কিন্তু কেন বলুন তো, মোহনবাবু? তাঁর পূর্ব্বজীবনের সঙ্গে বাবার নিরুদ্দেশ হওয়ার কোন সম্বন্ধ আছে বলে মনে করেন নাকি ?

মোহনলাল কহিল—আমাদের নিয়ম এই যে, কোন দিক থেকে কোন ঘটনাকে তুচ্ছ না করা, তা সে-ঘটনা যত সামান্যই হোক না কোন ?

তাহার পর আর কোন কথা হইল না। মোহনলাল একখান পত্র লিখিয়া তাহা ডাকে দিবার জন্য পোষ্টাপিসে চলিল। সতু রমলার কাছে রহিল। রমলা যাহাতে একাকী না থাকে সেদিকে মোহনলাল সতুকে বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দিয়াছে।

পথ চলিতে চলিতে মোহনলাল আপন মনে সরকার-বাড়ীর ঘটনাগুলি এবং সে-সম্বন্ধে নিজের মতামত ও সিদ্ধান্ত আলোচনা করিতে লাগিল।

বনের মধ্যে ভিখারী-গোছের অপরিচিত ভবঘুরে লোকটা কে এবং কেনই বা জয়রাম তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আহার যোগায় ?

সে কি রায় সাহেব স্বয়ং—ছদ্মবেশে আছেন বলিয়া সতু তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই? তা যদি হয় তাহা হইলে···

ফিরিবার সময় বনের ধার দিয়া মোহনলাল পথ অতিক্রম করিতেছিল; সে দেখিতে পাইল না, অদূরে বনের মধ্যে দাঁড়াইয়া একটা গাছের আড়াল হইতে একজন অপরিচ্ছন্ন দুঃস্থ গোছের ছেঁড়া-জামাকাপড়-পরা লোক দুই চক্ষু মেলিয়া তাহাকেই লক্ষ্য করিতেছে। লোকটার আকৃতি স্বাভাবিক নয়—দুই চোখে সদাজাগ্রত ভয়, ভাবভঙ্গীতে সন্ত্রস্ততা! কাপড়-চোপড় ছেঁড়া আর ময়লা হইলেও লোকটার পায়ে এক জোড়া নূতন জুতা, যাহা ঠিক খাপ খায় নাই, তাই পথ চলিবার সময় তাহাকে খোঁড়াইতে হইতেছিল। চলিতে চলিতে হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

সন্ধ্যার ছায়ায় চারিদিক অন্ধকার; লোকটা কান খাড়া করিয়া রহিল। অদূরে জুতার শব্দ! কেহ বোধ হয় এই দিকেই আসিতেছে। ভয়ে লোকটা শীর্ণ হইয়া উঠিল।

জুতার শব্দ কাছে আসিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। লোকটা একটা গাছের আড়ালে গুড়ি মারিয়া বসিয়াছিল; দেখিল, আগন্তুক তাহার কাছেই দাঁড়াইয়াছে···একটা দিয়াশালাই জ্বলিল, সিগারেট ধরাইল, তারপর জ্বলন্ত কাঠিটার সাহায্যে আগন্তুক রিষ্টওয়াচে সময় দেখিল।

দিয়াশালাই-এর আলো আগন্তুকের মুখে পড়িয়াছে···তাহার মুখ দেখিয়া ভিখারী-গোছের লোকটা ভীষণ চমকিয়া উঠিল···

আগন্তুক ধীরে ধীরে পথ চলিতে লাগিল, সে জানিতে পারিল না যে তাহার পিছনে ছায়ার মত এক ব্যক্তি অনুসরণ করিতেছে !

*　　　　*　　　　*

মোহনলাল রমলা আর সতু বৈঠকখানায় বসিয়া গল্প করিতেছিল। সকালে যারপরনাই লাঞ্ছনা ভোগ করিলেও রমলা এখন আবার আগেকার মত সহজ ও সুস্থ মানুষে পরিণত হইয়াছিল। তাহার প্রাণখোলা কথাবার্ত্তা, সকল বিষয়ে তাহার বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টিভঙ্গী ও আলোচনা আবার পূর্ব্বের মতই স্বচ্ছন্দভাবে বহিয়া চলিয়াছিল। পিতার কোন খবর না পাওয়ায় তাহার মন বিকল হইলেও মোহনলালের নিকট সাহস পাইয়া সে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই, আশা করিতেছিল, আজকালের মধ্যেই তাহার পিতার খোঁজ পাওয়া যাইবে।

মোহনলাল বলিল—আমি যতক্ষণ ছিলাম না, ততক্ষণ সতু বোধ হয় খুব বকছিল রমলা দেবী ?

—না, খুব কেন, অনেক মজার মজার গল্প বলছিলেন ? আপনারা একবার বর্ম্মায় গিয়ে···

রমলার কথা শেষ হইল না ; অকস্মাৎ বাগানের মধ্যে পিস্তল গর্জ্জিয়া উঠিল।

—ওকি !

বিদ্যুৎবেগে মোহনলাল উঠিয়া দাঁড়াইল—চলে এসো, সতু। আপনি ঘর থেকে বেরুবেন না, রমলা দেবী।

উভয়ে দ্রুতবেগে বাগানে নামিল।

—কোন্ দিক থেকে শব্দটা এলো ?

—গোলাপ-বাগানের দিক থেকে। এই দিকে।

আগে সতু, পিছনে মোহনলাল, দু'জনে একটা শিউলি গাছের সুমুখে গিয়া দাঁড়াইল।

—বারুদের গন্ধ ! তাহলে এই জায়গা !

মেঘমুক্ত আকাশ হইতে চাঁদের আলো উজ্জ্বল হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ; সেই আলোয় দেখা গেল, অদূরে নার্সারি-ঘরের পাশেই মাটিতে একটি লোক পড়িয়া আছে। সতু কহিল—ওই দেখুন !

—দেশলাই আছে।

—আছে। বলিয়া সতু দেশলাই জ্বালিল। সঙ্গে সঙ্গে বিষম বিস্ময়ের ধাকা খাইয়া সে অস্ফুট উক্তি করিল—একি !

সকালে বনের মধ্যে কুঁড়ের ভিতর ভিখারী-গোছের যে-ব্যক্তিকে সতু দেখিয়াছিল, সেই লোকটিই তাহার পায়ের কাছে পড়িয়া আছে, পিস্তলের গুলি তাহার মাথার খুলি ভেদ করিয়াছে !!

এগারো

মোহনলাল কহিল—সতু, তুমি চট্ ক'রে থানায় ফোন্ ক'রে দারোগাকে আসতে বল, আর আমার টর্চ্চটা নিয়ে এসো।

সতু দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। ক্ষণকালের জন্য মোহনলাল বিমূঢ় হইয়া গেল, এ কী অপ্রত্যাশিত ভয়াবহ ব্যাপার···বাড়ীর

মধ্যে এক অজ্ঞাত ব্যক্তি পিস্তলের গুলিতে নিহত···রহস্য যেন ক্রমেই ভীষণতর আকার ধারণ করিতেছে···এক শান্ত ভদ্র জমিদার···তাঁহার বাড়ীতে এ কী উপদ্রব···প্রথমে তিনি স্বয়ং নিরুদ্দেশ···মালী খুন···গোয়েন্দার প্রাণনাশের চেষ্টা···বাড়ীর মেয়ের উপর বারবার আক্রমণ···তারপর এখন আবার এক হত্যা···অথচ, কেন, কি উদ্দেশ্য, কে বা হত্যাকারী, সে-সম্বন্ধে কোন সূত্র নাই!

কিছুক্ষণের মধ্যেই সতু ফিরিয়া আসিল, কহিল—তাহের খাঁ এখুনি আসছে।

তাহার হাত হইতে টর্চ্চ লইয়া মোহনলাল কহিল—এই দিকে এসো।

উভয়ে গোলাপ-বাগানের পিছনে যে নাতিউচ্চ প্রাচীর ছিল সেইদিকে গেল। টর্চ্চের আলোয় স্পষ্ট পায়ের দাগ দেখা গেল। নরম মাটির উপর দেওয়ালের নীচেই কয়েকটা পদচিহ্ন; দেওয়ালের গায়ে লতানে-গাছগুলো বিপর্য্যস্ত।

মোহনলাল কহিল—এইখান দিয়ে দু'জনে নেমেছে!

—দু'জনে?

ঘাড় নাড়িয়া মোহনলাল কহিল—হ্যাঁ, দু'জনে। দু'রকম জুতোর ছাপ পাওয়া যাচ্ছে। হত্যাকারী আগে নেমেছে; তারপর নিহত ব্যক্তি।

—কেমন করে তা জানলেন?

মোহনলাল কহিল—তুমি যদি নিহত ভিখারীটার জুতো দেখ,

তাহলে দেখবে তার জুতো জোড়া প্রায় নতুন আর তার মুখ সরু। এখানে জুতোর যে-সব ছাপ পড়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, সরু-মুখো জুতোর ওপর একটা বড় পায়ের চওড়া-মুখ জুতোর ছাপ পড়েছে নানা স্থানে।

—কিন্তু ভিখারীটা গোলাপ বাগানে কি করতে এসেছিল?

—সে তো আমারও প্রশ্ন। কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর দেবে কে?

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহের দারোগা আসিল এবং অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া তাহার রিপোর্ট লিখিয়া লইল।

দারোগার কথায় জানা গেল, সরকার বাড়ীর 'মৃত্যুদূতের' কথা গ্রামের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে এবং অধিকাংশ লোকেই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছে। তাহার উপর আজ আবার আর-একটা হত্যা!

রিপোর্ট লিখিয়া দারোগা অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করিবার জন্য বাড়ীর মধ্যে গেল।

এমন সময় হঠাৎ জয়রাম সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার চোখমুখে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও কাতর ভাব।

—আবার কে খুন হ'ল হুজুর!

—তা তো জানি না। এ-বাড়ীর কেউ নয়। একজন ভিখারী-গোছের গরীব লোক।

মোহনলালের কথা শুনিয়া জয়রাম হঠাৎ অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিল—না, না। সে নয়! লাশ? লাশ কোথায় হুজুর!

—ওই যে! বলিয়া মোহনলাল টর্চের আলো ঘুরাইয়া ধরিল।

মৃতদেহের মুখের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই জয়রাম আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

—এ কে! জীবন! জীবু! সর্ব্বনাশ! কাঁপিতে কাঁপিতে জয়রাম বসিয়া পড়িল! মোহনলাল তাহার পিঠে হাত দিয়া কহিল—চুপ কর জয়রাম! স্থির হয়ে বল দেখি কি ব্যাপার? এ লোকটাকে তুমি চেন?

জয়রাম ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল; তারপর কম্পিত করুণ কণ্ঠে কহিল—এ আমার ছেলে জীবনরাম!

মোহনলাল ও সতু উভয়েই জয়রামের কথা শুনিয়া প্রচণ্ড বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইল! জয়রামের পুত্র!

কিছুক্ষণ চুপচাপ! তারপর মোহনলাল কহিল—ও এখানে করছিল কি?

—তা জানি না হুজুর!

—বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকতো কেন?

জয়রাম কহিল—আপনাকে বলব সব কথা। জীবনরাম দু'বার চুরী ক'রে জেল খেটেছে। এবারও জেলে ছিল, কেমন করে জানি না, জেল থেকে পালিয়ে এসেছে! ও জানতো আমি এখানে কাজ করি, তাই খেতে না পেয়ে আমার কাছে এসেছিল। আমি ওর মুখ দেখতাম না—কিন্তু তিনদিন ধ'রে খেতে পায়নি শুনে···

—আমরা জানি। তুমি তাকে বনের মধ্যে লুকোবার স্থান দিয়েছিলে এবং খাবার জোগাতে রোজ!

—হুজুর! হাজার হলেও ও তো আমার ছেলে···

কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তার পর মোহনলাল কহিল—ওকে গুলি করলে কে এবং কেন, এ-সম্বন্ধে তুমি কি জান?

—এ-সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, হুজুর।

—সে বোধ হয় তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই এ-সময়ে গোলাপ-বাগানে এসেছিল ?

মাথা নাড়িয়া জয়রাম কহিল—না হুজুর, আমি তাকে পই পই ক'রে বারন করে দিয়েছিলাম, সে যেন কিছুতেই বাড়ীর মধ্যে না ঢোকে। সেও বলেছিল, বনের ভিতর থেকে বেরুবে না।

দারোগা তাহের খাঁর সাড়া পাওয়া গেল। মোহনলাল তাড়াতাড়ি জয়রামকে কহিল—দারোগাকে কিছু বলবার দরকার নেই।

তাহের আসিয়া জানাইল, অ্যামবুলেন্স এখনি আসিবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জয়রামের অপরাধী ও ফেরার কয়েদী-পুত্র জীবনরামের লাশ লইয়া পুলিশ চলিয়া গেল।

*　　　*　　　*

সতু কহিল—কোথায় চল্লেন ?

মোহনলাল এদিক ওদিক চাহিয়া কহিল—আমি একটু ঘুরে আসচি। তুমি কোথাও যেও না—রমলার কাছে থেকো।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সতু বাড়ী ভিতর গেল।

বাগানের প্রান্তে পৌঁছিয়া টর্চ্চের আলো জমির উপর ফেলিয়া মোহনলাল কি যেন খুঁজিতে লাগিল।

জীবনরামকে হত্যা করিল কে ? কেনই বা ? একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়ীতে এমনধারা খুনোখুনি ব্যাপার মোহনলালের অভিজ্ঞতায় নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, হত্যাকারীর পিছনে

পিছনে জীবনরাম এখানে আসিয়াছে ! তাহা হইলে, জীবনরাম কি হত্যাকারীকে অনুসরণ করিতেছিল ?

পদচিহ্ন লক্ষ্য করিতে করিতে মোহনলাল দেওয়ালের পাশ দিয়া মাঠের মধ্যে নামিল। উঁচু নীচু জমি ; স্থানে স্থানে বুনো গাছের ঝোপঝাড়ে দুর্ভেদ্য।

টর্চের আলো ফেলিয়া মোহনলাল জুতোর ছাপগুলির গতি নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিতেছে এমন সময় হঠাৎ একটা শব্দ তাহার কানে গেল···

চকিতে মোহনলাল একটা শালগাছের আড়ালে সরিয়া গেল··· তাহার ভুল হয় নাই···কেহ যেন এইদিকেই আসিতেছে। স্থির নিস্পন্দভাবে মোহনলাল অপেক্ষা করিতে লাগিল। সামনেই ফাঁকা পথ, চাঁদের আলোয় আলোকিত। লোকটা কি সেই পথ অতিক্রম করিবে?

ক্রমে পদশব্দ নিকটে আসিল···একটা কালো মূর্ত্তি, ঘাড় ঝুলিয়া পড়িয়াছে, মুখ দেখা যাইতেছে না···ধীরে ধীর পা ফেলিয়া চলিয়াছে! মোহনলালের স্নায়ুতন্ত্রীগুলি কঠিন আকার ধারণ করিল। তাহার সম্মুখে 'মৃত্যুদূত' !!

ছায়ামূর্ত্তি অদৃশ্য হইতেই মোহনলাল তাহাকে অনুসবণ করিল। আজ তাহাকে মুখোমুখী দেখিতে হইবে। সম্মুখবর্ত্তী মূর্ত্তি আগাইয়া চলিয়াছে। মোহনলাল তাহার হাত কুড়ি পিছনে। হঠাৎ একটা শুক্‌নো ডালের উপর মোহনলালের পা পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে মড়মড় শব্দ হইল, সেই শব্দে চমকিয়া পিছন ফিরিয়া দেখিয়াই মূর্ত্তিটা

ছুটিতে আরম্ভ করিল। ছুটিবার সময় তাহার ঝুঁকিয়া-পড়া ভঙ্গী অন্তর্হিত হইল। মোহনলাল দেখিল, লোকটা সত্য সত্যই বেঁটে নয়।

দুইজনেই প্রাণপণে ছুটিতেছে। উঁচুনীচু পথে দুইজনেই হোঁচট খাইতেছে। তাহাদের পায়ের তলায় পড়িয়া শুকনো ডাল আর লতাপাতার শব্দে নিস্তব্ধ বনতল মর্ম্মরিত হইতেছে···

লোকটা একটা উঁচু জমির পাশ দিয়া ছুটিতে লাগিল। মোহনলাল যখন সেখানে পৌছিল তখন মূর্ত্তিটা একটা গাছে সঙ্গে ধাক্কা খাইয়া ঠিকরাইয়া পড়িয়াছে।

উঠিয়া দাঁড়াইবার আগেই মোহনলাল তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। হিংস্র শব্দ করিয়া মূর্ত্তিটা তাহার হাত হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু সুকৌশলী গোয়েন্দার হাতের চাপে তাহার আর শক্তি রহিল না।

দাঁতে দাঁত চাপিয়া মোহনলাল বলিল—এইবার দেখি তোমার মুখখানা।

এই বলিয়া সে মূর্ত্তিটার মুখে যে রুমাল জড়ানো ছিল, টান মারিয়া তাহা খুলিয়া ফেলিল।

—একি! এযে গোপেন বাবু!

মোহনলালের হাতে বন্দী হইয়াছে গোপেন রুদ্র!

বারো

—মোহনলাল বাবু!

গোপেনের মুখ দিয়া অস্ফুট বিস্ময়োক্তি বাহির হইল—আপনি!

কিছুক্ষণ মোহনলালের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। অবশেষে গোপেনই কি 'মৃত্যুদূত'! এযে একেবারে অসম্ভব ব্যাপার!

—দোহাই আপনার। হাতটা একটু আলগা করুন, মোহনবাবু, আমি উঠে দাঁড়াই, যদি জানতাম যে আপনি আমার পিছনে তাহলে এ-ভাবে ছুটে পা ভাংতাম না। আমি ভেবেছিলাম, অন্য লোকটা আমায় তাড়া করেছে।

—অন্য লোকটা? কে সে?

গোপেন বলিল—আমি যার পিছু নিয়েছিলাম। আপনি নিশ্চয়ই মনে করছেন না যে আমিই আসল 'মৃত্যুদূত'?

—কিন্তু আপনার এ-বেশভূষা! এ-ভাবে বিচরণ—এর অর্থ কি?

—বলছি আপনাকে। দম নিতে দিন।

উভয়ে সোজা হইয়া দাঁড়াইল। মোহনলাল এতক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গোপেনের মুখের ভাব লক্ষ্য করিতেছিল; কিন্তু অপরাধীর বিব্রত ত্রস্ত ভাব তো সেখানে নাই!

গোপেন বলিতে লাগিল—রমলার ওপর আক্রমণের কথা শুনে আমি স্থির করলাম, আমি নিজে একটু গোয়েন্দাগিরি করে দেখবো, 'মৃত্যুদূত'কে ধরতে পারি কি না। তাই আমি এই ছদ্মবেশ গ্রহণ করেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, বাড়ীর ভিতর না থেকে যদি রাত্রে বাড়ীর বাইরে লক্ষ্য রাখা যায় তাহলে হয়ত তার দেখা পাওয়া যেতে পারে। আমার চেষ্টা ব্যর্থ হয় নি! আমি তাকে দেখেছি।

—দেখেছেন! কোথায়?

—কাছেই। আমি এইখানটায় ঘুরছিলাম এমন সময় বাগানের মধ্যে পিস্তলের শব্দ শুনে এগিয়ে গিয়ে দেখি, লোকটা হন্ হন্ করে বাগান থেকে বেরিয়ে এই পথ দিয়ে চলেছে।

—তারপর ?

—তারপর আমি তার পিছু নিয়ে তার লুকোবার আড্ডা দেখে এসেছি। উ হু হু !

—কি হল ?

কাতর কণ্ঠে গোপেন কহিল—ডানপায়ের হাঁটুটা দারুণ মুচড়ে গেছে। চলতে পারছি না ! একটু বসা যাক।

গোপেন একটা ঢিবির উপর বসিল। টর্চ্চের আলোয় তাহার পা পরীক্ষা করিয়া মোহনলাল দেখিল, আঘাত সামান্য নয়—হাঁটুটা রীতিমত ফুলিয়া উঠিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে মোহনলাল প্রশ্ন করিল—কতদূরে সেই গুপ্ত আড্ডা, গোপেন বাবু ?

—বেশী দূর নয়। এখান থেকে আধ মাইল। এই বনের শেষে একটা প্রকাণ্ড চুনা-পাথরের ঢিবি আছে; আমি দেখেছি লোকটা সেই ঢিবির একটা গহ্বরের মধ্যে নেমে গেল। ফেরবার সময় আপনার তাড়া খেয়ে আমার ভয় হ'ল হয়ত আমি চলে আসবার পর লোকটা আবার সেখান থেকে বেরিয়ে আমায় দেখে আমার পিছু নিয়েছে।

মোহনলাল কহিল—যাই হোক, হাঁটুর কিছু ক্ষতি হলেও আপনি আজ যে মূল্যবান আবিষ্কারটি করেছেন তাতে হাঁটুর ব্যথা পুষিয়ে

যাবে। আমি একবার স্থানটা দেখে আসি। কিন্তু তার আগে আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দেওয়া দরকার। বাড়ী গিয়েই হাঁটুর ব্যবস্থা করবেন। দেশী ওষুধ চুনে-হলুদই এ সব বিষয়ে সব চেয়ে বড় ওস্তাদ।

—চলুন না। আমিও কেন……

—পায়ের এই অবস্থা নিয়ে? তাতে সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশী হবে গোপেন বাবু।

—কিন্তু আপনি একা?

—ভয় নেই গোপেন বাবু। এ-সব ব্যাপারে আমি অভ্যস্ত আছি!

গোপেনের বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া মোহনলাল তাহার নিকট হইতে বিদায় লইল।

* * * *

এই কি 'মৃত্যুদূতের' আস্তানা? প্রকাণ্ড একটা পাথরের ঢিবি; তিনতালা সমান উঁচু, চাঁদের আলোয় যেন বরফের স্তূপের মত দেখাইতেছে।

প্রায় আধ ঘণ্টা অবিশ্রাম অন্বেষণের পর মোহনলাল ইহার সন্ধান পাইয়াছে। কিন্তু কোন্ দিকে ইহার প্রবেশপথ? ধীরে ধীরে সে ঢিবির কাছে গিয়া দাঁড়াইল…চারিদিকে জমাট পাথর… ইঁদুর ঢুকিবার ছিদ্রও দেখা যায় না। ঘুরিতে ঘুরিতে সে ঢিবির পিছন দিকে গিয়া দাঁড়াইল। একস্থানে একটা বড় পাথর দাঁড় করানো, তাহার পাশ দিয়া সরু সুড়ঙ্গ-পথের আভাস পাওয়া

যাইতেছে। মোহনলাল পাথরখানাকে সরাইবার চেষ্টা করিতেই তাহা ধীরে ধীরে এক পাশে হেলিয়া পড়িল ; সুড়ঙ্গর মধ্যে প্রবেশের দরজা উন্মুক্ত হইল !

ভিতরে গাঢ় অন্ধকার। অকুতোভয় গোয়েন্দা সেই অন্ধকারে পা বাড়াইল। পথ ক্রমে নীচে নামিয়া যাইতেছে...

একস্থানে আসিয়া মোহনলালকে থামিতে হইল। সম্মুখে পাথরের আড়াল। পাশ দিয়া ক্ষীণ আলোর রেখা আসিতেছে। সেই আলো লক্ষ্য করিয়া মোহনলাল গহ্বরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

অকস্মাৎ পিছনে কি-একটা শব্দ লইল। মোহনলাল ঘুরিয়া দাঁড়াইবার আগেই মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পাইল। সে-আঘাতের টাল সামলাইতে না পারিয়া হতচেতন মোহনলাল কঠিন পাথরের উপর লুটাইয়া পড়িল।

তেরো

চারিদিকে গভীর রন্ধ্রহীন অন্ধকার ! ধীরে ধীরে চেতনালাভ করিয়া মোহনলাল দেখিল, গুহার এক কোণে হাতপাবাঁধা অবস্থায় সে পড়িয়া আছে। কতক্ষণ এ-ভাবে পড়িয়া আছে তা সে জানিতে পারিল না।

স্তব্ধবিমূঢ় মোহনলাল বুঝিল, শত্রু পূর্ব্ব হইতেই তাহার গতিবিধির উপর নজর রাখিয়াছিল !

ধীরে ধীরে অন্ধকার যেন স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছে···গুহার মধ্যে আবছা আলো দেখা দিল। তখন সে নিজের বন্দীশালাটিকে ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইল।

একধারে একখানা খাটিয়া রহিয়াছে, তাহার উপর কয়েকটা জামা-কাপড় এলোমেলো ছড়ানো। গুহার অপর-প্রান্তে তখনো অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল, তাই সেদিকটা স্পষ্ট দেখা না গেলেও, অন্ধকারের ভিতর শায়িত এক মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিয়া মোহনলাল বিস্ময়াপন্ন হইল!

কোন মতে গা ঘেঁসিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সে যাহা দেখিল তাহাতে তাহার বিস্ময় যেন আকাশ ছাপাইয়া উঠিল। হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় বাদামি ড্রেসিং-গাউন-পরা রায় সাহেব হেমচন্দ্র সরকার! তাহারই মত গুহার মধ্যে বন্দী! এ কী অপ্রত্যাশিত ঘটনা-প্রবাহ!

মোহনলালের মনের মধ্যে যে-সকল অনুমান দানা বাঁধিতেছিল, রায় সাহেবকে দেখিয়া তাহা সত্যের আভাস খুঁজিয়া পাইল!

রায় সাহেব জাগিয়া আছেন। তাঁহার দু'চোখে অবসাদ এবং উদ্বেগ। মাথায় একটা রুমাল বাঁধা। রুমালটা রক্তে ভিজা। মোহনলাল তাঁহার কাছে গিয়া চুপি চুপি বলিল— আমায় চিন্‌তে পারছেন রায় সাহেব? আমার নাম মোহনলাল?

ঘাড় নাড়িয়া রায় সাহেব জানাইলেন যে তিনি মোহনলালকে চিনিতে পারিয়াছেন।

তারপর বন্ধন খোলার পালা সুরু হইল। মোহনলাল রায়

সাহেবের সন্নিকটে গিয়া অতি কষ্টে হাত দিয়া তাঁহার মুখের বাঁধনটা খুলিয়া ফেলিল। সে-বাধন তেমন শক্ত করিয়া দেওয়া হয় নাই।

মুখের বন্ধন মোচন হইলে রায় সাহেব যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

—কি আশ্চর্য্য! মোহনলাল বাবু। আপনি! আপনি কেমন ক'রে এখানে এলেন?

মোহনলাল ধীরে ধীরে সকল কাহিনী বিবৃত করিল।

রমলার প্রতি আক্রমণের কথা শুনিয়া রায় সাহেব অস্ফুটে কহিলেন—সয়তান! স্কাউনড্রেল!

মোহনলালের প্রশ্নের উত্তরে রায় সাহেব স্বীকার করিলেন, কহিলেন—হ্যাঁ, আমারই পিস্তলের গুলিতে বেচারি ফনিলাল মারা পড়েছে। কিন্তু আমার কোন দোষ ছিল না, আমি জানতাম না যে সে-ও 'মৃত্যুদূত'কে ধরবার জন্যে লুকিয়ে লুকিয়ে তার পিছু নিয়েছিল!

মোহনলাল কহিল—আমি তা অনুমান করতে পেরেছিলাম। যে-গুলিতে ফনি মারা পড়েছিল সে-গুলি যে আপনার পিস্তল থেকেই ছোঁড়া হয়েছিল তার প্রমাণ পেয়েছি আপনার পিস্তলটি খুঁজে পেয়ে। আর-একটা পিস্তলের আওয়াজ হয়েছিল, সে-গুলি বোধ করি আপনার উদ্দেশ্যেই ছোঁড়া হয়েছিল।

রায় সাহেব ঘাড় নাড়িয়া নিজের বিক্ষত কপালটা দেখাইয়া বলিলেন—অতি অল্পের জন্যেই বেঁচে গেছি। কপালটা একটু ছ'ড়ে গেছে শুধু।

—কিন্তু কে এই ছদ্মবেশী 'মৃত্যুদূত'? কেনই বা সে এ-ভাবে আপনাকে বন্দী করে রেখেছে?

রায় সাহেবকে নিরুত্তর দেখিয়া মোহনলাল কহিল—আমার এ-সম্বন্ধে একটা অনুমান আছে। আমি আশা করি, আপনাদের মধ্যে সম্পর্ক থাকলেও আপনি তাকে আইনের গণ্ডী অতিক্রম করতে সাহায্য করবেন না। ভুলে যাবেন না, আপনার সম্বন্ধী নরহত্যার অপরাধে অপরাধী।

—তাহলে আপনি জানেন! হ্যাঁ, আপনার অনুমান সত্যি। আমার প্রথম স্ত্রীর ভাই এই ষড়যন্ত্রের নায়ক; না, আমি তাকে ক্ষমা করব না। আপনি জানেন না, মোহনবাবু, আমার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর জন্যেও তাঁর ওই ভাই দায়ী। আগ্রায় আমার প্রথম বিবাহ হয়। এক ভাই ছাড়া মৃণালিনীর আর-কেউ ছিল না। লোকনাথকে আমি অনেক সাহায্য করেছি; ভাল চাকরি জোগাড় করে দিয়েছি, ব্যবসা করবার জন্যে টাকা দিয়েছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি; এক-একজন মানুষ আছে যাদের রক্তের মধ্যে অপরাধের বীজাণু থাকে, কিছুতেই তারা সৎ সরল পথে জীবন কাটাতে পারে না, লোকনাথ সেই দলের। একবার চুরীর অপরাধ থেকে সে কোনমতে রক্ষা পায়; দ্বিতীয়-বার জালিয়াতির অপরাধে তার জেল হয়। ভাই-এর জঘন্য চরিত্রের কথা শুনে দুঃখে অপমানে মৃণালিনীর শরীর ভেঙে পড়ে, সে ভাঙ্গা স্বাস্থ্য আর জোড়া লাগেনি। ভাই-এর জন্যে ভেবে ভেবে বেচারার অকালে আয়ুশেষ হয়। লোকনাথ তখন জেলে।

—তারপর ?

—তারপর আমি রমলার মাকে বিবাহ করি এবং কাজ থেকে অবসর নিয়ে সরকার-বাড়ীর গুপ্ত-রত্নের রহস্য সমাধানের চেষ্টায় ব্যাপৃত হই। এই সময় বসিরহাট থেকে এক পত্র আসে; লেখক লোকনাথ; তাতে সে জানায় যে জেল থেকে সে ছাড়া পেয়েছে, এখন তার টাকার দরকার।

—বসিরহাট থেকে পত্র পান ? মোহনলাল কৌতূহলী-কণ্ঠে কহিল—পত্রখানা আছে আপনার কাছে ?

—আছ বোধ হয় লাইব্রেরী-ঘরের দেরাজে। যাই হোক, আমি সে-পত্রের কোন জবাব দিই না। কয়েকদিন আগে গুপ্ত-রত্নের একটা সমস্যার সমাধান করতে পেরে আমি উৎফুল্ল হই এবং সেইদিন রাত্রেই ঘুমুতে না পেরে জানলায় দাঁড়িয়ে বাগানে একটা ছায়ামূর্ত্তি দেখে আমি চোর মনে ক'রে পিস্তল নিয়ে তাড়া করি। এই হ'ল সেদিনকার ঘটনা। আমায় দেখে মূর্ত্তিটা গুলি ছোঁড়ে, আমিও গুলি ছুঁড়ি। তার গুলিটা আমার কানের পাশে লেগে আমায় অজ্ঞান করে' ফেলে; জ্ঞান হ'য়ে নিজেকে এখানে এই অবস্থায় দেখতে পাই এবং আমার সুমুখে দণ্ডায়মান লোকনাথকে চিনতে পারি। আমার কথার উত্তরে লোকনাথ জানায় যে মৃত্যু-দূতের ছদ্মবেশে সে-ই এ-কদিন ধ'রে সরকার-বাড়ীতে রাত্রে আনাগোনা করছে; উদ্দেশ্য, গুপ্ত-রত্নের সন্ধান করা এবং আমার কাছ থেকে টাকা আদায় করা। আমি তাকে টাকা দিতে অস্বীকার করলে সে বলে যে যতদিন টাকা বা গুপ্ত-রত্ন সে না পায় ততদিন

সে আমায় এইখানে বন্দী ক'রে রাখবে এবং রমলাকেও লাঞ্ছনার হাত থেকে নিস্কৃতি দেবে না……

মোহনলাল প্রশ্ন করিল—গুপ্তরত্নের কথা সে জানলে কেমন করে?

রায় সাহেব বলিলেন—এতো অনেকদিনের পুরণো জনশ্রুতি। আমার প্রথম বিয়ের পর আমাদের বংশের ইতিহাস লোকনাথ আমার কাছ থেকেই শোনে। তারপর, আমি যে ইদানিং এ বিষয়ে একটা সন্ধান পেয়েছি, সে-খবর সে কৌশলে দিনের বেলায় ডিমওয়ালা সেজে সরকার বাড়ীতে এসে চাকর বাকরদের কাছ থেকে আদায় করে। এ খবর বিশেষ লুকনোও ছিল না। আমাকে মাঠ থেকে তুলে আনবার সময় লোকনাথ আমার পকেটে একটা লকেট-দেওয়া চেন্ দেখতে পায়, সেই চেন সে ফনিলালের হাতে গুঁজে রেখে আসে। এখানে এনে সে আমায় এই বলে ভয় দেখায় যে, আমি ফনিকে খুন করেছি এবং আমার চেন ফনির হাতে পুলিশ দেখতে পাবে, সুতরাং তার কথায় আমি রাজী না হলে সে আমায় পুলিশে ধরিয়ে দেবে! এই সব কারণে আমি তাকে গুপ্ত-রত্নের রহস্য বলতে বাধ্য হই।

—বলেন কি! সে কি জানতে পেরেছে…

—হ্যাঁ, খানিকক্ষণ আগে সে আমার কাছ থেকে জেনেছে। কিন্তু ঠিক কোন্ স্থানে প্রবালের কৌটাটি লুকান আছে, তা আমি এখনো জানতে পারি নি, তাই সে-ও জানে না। আমি সে পরীক্ষা করবার সুযোগ পাই নি।

—আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না। আর একটু পরিষ্কার ক'রে বলুন।

রায় সাহেব বলিলেন—এ বিষয়ে একটা ছড়া আছে, সেটি হচ্ছে এই :—

"ধনুক থেকে তীরটি ছাড়া হ'লে
একদিকে সে যায়
উত্তর কি দক্ষিণ, পশ্চিম কি পূব
বাতাস যেথা বয় সেখান থেকে নয়,
শেষে যেথায় থামে এসে তীর
সেইখানেতে খোঁজ, পাবে, হ'য়ো না অস্থির।"

অনেক ভেবেচিন্তে আমি স্থির করি যে বাড়ীর এমন যায়গা থেকে তীর ছুঁড়তে হবে যেখানে বাতাস বয় না, অর্থাৎ কোন ঢাকা জায়গা থেকে, অর্থাৎ বাড়ীর কোন ঘর থেকে। বাড়ীর ভিতরে এমন কোন্ জায়গা আছে যেখান থেকে একটা তীর ঠিক সোজা ছোঁড়া যেতে পারে তাই খুঁজতে খুঁজতে আমি তেতালার একটা অব্যবহৃত ঘরের দেওয়ালে একটি ছিদ্র দেখতে পাই। ছেঁদাটা যেখানে দেওয়াল ভেদ করেছে—তার পিছনেই বাগান। আমার বিশ্বাস মোহনলাল -বাবু, সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়ে কোন তীর ছোঁড়া হ'লে সেই তীর যেখানে গিয়ে পড়বে সেখানেই লুকানো আছে গুপ্ত-রত্ন।

মোহনলাল কহিল—এ খবর লোকনাথ জানে ?

—জানে। কিন্তু এখন সকাল হ'য়ে গেছে। আজ রাত্তির ছাড়া সে এ-সম্বন্ধে কোন সন্ধান ক'রতে পারবে না। তা ছাড়া

তাকে তেতালার সেই ঘরে উঠতে হবে। অবশ্য সেদিকে বাগান থেকে একটা লোহার ঘোরানো সিঁড়ি আছে, সেদিকে চাকর বাকর কেউ যায় না, তাই হয়ত তার পক্ষে সে-ঘরে ওঠা শক্ত হবে না।

রায় সাহেব নীরব হইলে বারেক চারিদিক চাহিয়া মোহনলাল বলিল—কিন্তু আমরা তাকে প্রতিরোধ করব কেমন ক'রে?

এমন সময় বাহিরে ঘড় ঘড় শব্দ হইল। চুপি চুপি রায় সাহেব কহিলেন—লোকনাথ আসছে।

মোহনলাল সরিয়া আসিল। কিছুক্ষণ পরে এক ব্যক্তি ঘরে ঢুকিল। মোহনলাল দেখিল তাহার অঙ্গে মৃত্যুদূতের কালো আবরণ না থাকিলেও, মুখে কাপড় জড়ানো, শুধু চোখ দুইটা ও কপালের কিয়দংশ বাহির হইয়া আছে।

ঘরে ঢুকিয়া বিকৃত স্বরে লোকনাথ বলিল—এইযে! দুই বন্ধুতে বোধ করি আলাপ চলছিল: হুঁ, রায়সাহেবের মুখের বাঁধনটি খোলা হয়েছে।

এই বলিয়া সে মোহনলালকে টানিতে টানিতে ঘরের আর এক প্রান্তে লইয়া গেল এবং পুনরায় তাহার হাত পা এবং মুখ বাঁধিল। রায় সাহেবও বাদ গেলেন না।

মোহনলাল একদৃষ্টে লোকনাথের দুই চোখের পানে তাকাইয়া ছিল। তাহার মুখ বাঁধিবার আগে মোহনলাল প্রশ্ন করিল—একটা কথা, লোকনাথ; তোমার কাছে আমরা পরাজিত। শুধু জানতে চাই, জীবনরামকে তুমি খুন করলে কেন?

তাহার হাত মুখ বাঁধিয়া তেমনি বিকৃত স্বরে লোকনাথ কহিল —কেন? আচ্ছা বলছি। হ্যাঁ, তাকে খুন করেছি। সে আমায় চিনতে পেরেছিল···হঠাৎ বনের মধ্যে দেখা। এক সঙ্গে জেলে ছিলাম। বলে, সে আমায় ধরিয়ে দেবে, তাই তাকে মরতে হ'ল! যাক, আমার কাজ শেষ, আজ রাত্রে একবার শেষ চেষ্টা করব। আশা করি, বিফল হব না। তারপর আর লোকনাথের খোঁজ পাওয়া যাবে না। অত্যন্ত দুঃখিত, তোমাদের দু'জনকেই মরতে হবে।

লোকটার কণ্ঠস্বরে লেশমাত্র সজীবতা নাই—যন্ত্রচালিতের মতো কঠিন আর নিস্প্রাণ। বগল হইতে একটা বাণ্ডিল বাহির করিয়া তাহার ভিতরকার জিনিষগুলি সে গুহার এক কোনে স্থাপন করিল; তারপর একটা সরু তার লইয়া তাহাদের সহিত যুক্ত করিয়া দিল। মোহনলাল শিহরিয়া উঠিল। ডিনামাইট! এই ডিনামাইট যদি ফাটে তাহা হইলে তাহাদের দেহ ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে—মৃত্যু সুনিশ্চিত!

তেমনি অবিচলিত কণ্ঠে লোকনাথ বলিতে লাগিল—পল্‌তেয় আগুন দিয়ে দিলাম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এটা ফাটবে, তখন এই গুহার সঙ্গে তোমাদের দেহও মাটিতে মিশিয়ে যাবে। বিশেষ কষ্ট হবে না—মিনিট খানেকের মধেই সব শেষ হ'য়ে যাবে। কি করব, এ-ছাড়া আর উপায় ছিল না।

পলিতায় আগুন ধরানো হইল। রায় সাহেব গোঁ গোঁ করিতে লাগিলেন। মোহনলাল স্থির। তাহার দুই বিহ্বল চোখের দৃষ্টি পলিতার অগ্নিস্ফুলিঙ্গের প্রতি নিবদ্ধ।

লোকনাথ আগস্তি বাহির হইয়া গেল। আগুনের ফুলকি ক্রমশঃ অবধারিত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

চৌদ্দ

রাত্রি বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সতুর দুশ্চিন্তাও বাড়িতে লাগিল। এমন তো কখনো হয় না। 'এখুনি আসিতেছি' বলিয়া মোহনলাল কোথায় গেল? ক্রমশঃ সে অত্যন্ত অধীর অস্থির বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু কি করিবে সে, কোথায় যাইবে? মোহনলাল যে কোথায় গিয়াছে তাহা তাহার জানা নাই। এমত অবস্থায়…

তাছাড়া, রমলাকে একাকী রাখিয়া সতুর কোথাও যাওয়া সম্বন্ধে মোহনলালের স্পষ্ট নিষেধ আছে।

সারা রাত সতু অত্যন্ত অস্থির ভাবে কাটাইল। রাত যখন প্রায় শেষ তখন সে আর থাকিতে পারিল না, নীচে নামিয়া আসিল। অন্তত বাগানটা খুঁজিয়া দেখা যাক…

সারা বাড়ী সুসুপ্ত। রমলার ঘরে আলো জ্বলিতেছে। হয়ত সে-ও ঘুমাইতে পারিতেছে না…

সতু নীচে নামিয়াছে এমন সময় ব্যস্তভাবে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গোপেন আসিয়া হাজির…

—একি! এত রাত্রে গোপেন বাবু…

—বলছি। আগে বলুন, মোহনলাল বাবু ফিরেছেন কি?

—না।

—সর্ব্বনাশ! যা ভেবেছি তাই।

—কি হয়েছে?

রাত্রে বনের ধারে মোহনলালের সহিত সাক্ষাৎ এবং তারপর চুনাপাথরের পাহাড় অভিমুখে মোহনলালের যাত্রা করিবার কাহিনী বিবৃত করিয়া গোপেন কহিল—বাড়ী গিয়ে স্থির হতে পারলাম না। চুনে-হলুদ দিয়ে পাটাও অনেকখানি ঠিক হয়েছে, তাই চলে এলাম। ভাগ্যে এলাম। এখন চলুন, যাওয়া যাক, হাঁ ক'রে ভাবছেন কি?

ছুটিয়া উপর হইতে পিস্তলটা আনিয়া সতু কহিল—চলুন।

পথ চলিতে চলিতে গোপেন কহিল—পাহাড়ে পৌছবার 'শর্ট-কাট্' (পথ সংক্ষেপ) আমি জানি।

সতু কহিল—আমি কোন কাট্-ই জানি না। আপনি না থাকলে···

—চুপ, কে যেন আসছে।

দু'জনে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। মানুষ নয়, বোধ হয় একটা শেয়াল মানুষ দেখিয়া ভিন্ন পথে পলায়ন করিল।

*   *   *

—এইবার আস্তে! সাম্‌নে টিবি। ওর ভেতর আছে গুহা। আমি লোকটাকে ওই গুহায় ঢুকতে দেখেছিলাম কাল রাত্রে।

গোপেনের কথা শুনিয়া সতু মুখ তুলিয়া চাহিল। ভোরের আলোয় শাদা পাথরগুলা সবুজ মাঠের মধ্যে অত্যন্ত অদ্ভুত দেখাইতেছে।

—এইখান দিয়ে আসুন।

পায়ে চোট লাগা সত্ত্বেও আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রতার সহিত গোপেন একখানা পাথর ঠেলিয়া সরাইয়া দিল। সম্মুখে সুড়ঙ্গ-পথ।

—পিস্তল বাগিয়ে সতু বাবু।

নিঃশব্দে কম্পিত কক্ষে দু'জনে গুহায় নামিল। প্রথমে তাহারা কিছু দেখিতে পাইল না। গোপেন বলিল—বারুদের গন্ধ পাচ্ছি যেন। ওই যে…

একটা ছোট ঘরের মধ্যে দুই ব্যক্তি পড়িয়া আছে।

—মোহনলাল বাবু।

সতু ছুটিয়া মোহনলালের কাছে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই রায় সাহেব ও মোহনলাল বন্ধন-মুক্ত হইল।

রায় সাহেব চিৎকার করিয়া উঠিলেন—ডিনামাইট! এখুনি ফাট্‌বে।

সতু ও গোপেন চমকিয়া উঠিল। মোহনলাল কহিল—চট্‌পট বেরিয়ে চল সকলে। ডিনামাইটের পলতেয় আগুন ধরানো। না, না, নিভিয়ে ফেলার দরকার নেই—ওর কাজ হোক। তাতে আমাদের সুবিধে।

চারজনে চুনা-পাথরের পাহাড় হইতে নামিবার কিছু পরেই ভীষণ শব্দ হইল…পাথরের বড় বড় চাব্‌ড়া শূন্যে ছড়াইয়া পড়িল… তারপর সমস্ত পাহাড়টা ধ্বসিয়া ভাঙ্গিয়া মাটির সহিত মিশিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

রায় সাহেব আর একবার শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন—উঃ! কি ভীষণ!

পনেরো

সরকার-বাড়ীতে পৌঁছিয়া মোহনলালের প্রথম আদেশ হইল, আজ সারাদিন এবং সারা রাত বাড়ীর কোন লোক, চাকর-বাকর কেহ এবাড়ীর চৌকাঠ পার হইবে না এবং আজ চব্বিশঘন্টা বাড়ীর সকল দরজা-জানলা বন্ধ থাকিবে।

পিতাকে ফিরিয়া পাইয়া হর্ষোদ্বেল রমলা হাসিয়া কাঁদিয়া বাপের বুকে মুখ লুকাইল। রায় সাহেব কন্যাকে লইয়া নিজের মহলে চলিয়া গেলেন। তাঁহার বিশ্রামের প্রয়োজন হইয়াছিল।

কিছু আহারাদির পর মোহনলাল নীচের ঘরে সতু ও গোপেনকে লইয়া আজ দিন ও রাত্রির কর্ম্মপ্রণালী স্থির করিতে বসিল।

এমন সময় মহা সোরগোল তুলিয়া এক ব্যক্তি দরজার মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

—আরে, ইনসপেকটার কবীর!

—সুপ্রভাত ভদ্রমহোদয়গণ!

মোহনলাল সোচ্ছ্বাসে বলিল—ইনসপেকটার কবীর! তোমাকেই আমি এইমাত্র স্মরণ করছিলাম।

—তার জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু চাকরগুলো তো কিছুতেই আমায় ঢুকতে দেয় না, বলে বারণ আছে। শেষে ঠেলে ঢুকতে হল।

মৃদু হাসিয়া মোহনলাল কহিল—এসো বসো।

ইসারা করিয়া জয়রামকে বলিল—ঠিক আছে। তুমি যেতে পারো। তারপর, কি খবর ইনসপেকটার?

—কয়েকটা জরুরী পরামর্শের জন্যে এলাম। ইনসপেক্টার কহিল—সেই নরহরি-সংক্রান্ত ব্যাপার। এখনো কিছু কিনারা করতে পারি নি। তাই…

দীপ্তচক্ষে মোহনলাল কহিল—পারবে, ইনসপেকটার, শীঘ্রই পারবে। ও সব পরামর্শ কালকের জন্যে মুলতবী থাক। কাল তোমার সব কিনারা ক'রে দেব।

দুই চোখ বড় করিয়া ইনসপেক্টার কহিল—কাল সব কিনারা ক'রে দেবেন! মানে?

—মানে, আজ রাত্রে তোমায় এমন তাক্ লাগিয়ে দেব যে কাল আর মানে জিজ্ঞাসা করতে হবে না। উপস্থিত আর কিছু জিজ্ঞাসা ক'রো না; এখন খাও, দাও, বিশ্রাম কর।

সারা দিন মোহনলাল আর কোন কথা বলিল না, মাঝে মাঝে দু'চারবার বাড়ীর তিনতালায় এবং বাগানে গিয়া ঘোরাফেরা করিল।

সন্ধ্যার সময় বৈঠকখানায় সকলে সমবেত হইলে, মোহনলাল কহিল—আমরা চারজন আটটার পর থেকেই তিনতালার ঘরে অপেক্ষা করব। রায় সাহেব মিস সরকারকে নিয়ে তাঁর ঘরে থাকবেন। চাকর-বাকরেরা সকাল-সকাল শুয়ে পড়বে।

রাত্রে কিছু একটা ব্যাপার ঘটিবে। সকলেই সন্ত্রস্ত, সকলেই উত্তেজিত। ইনসপেকটার কবীর হতচকিত, বিমূঢ়।

সতু কহিল—কিন্তু প্রবাল-কৌটার গুপ্তস্থানটা যে কোথায় তা এখনো জানা গেল না।

মোহনলাল কহিল—কে বললে জানা গেল না? আমি আজ সকালে জেনেছি।

—জেনেছেন! কিন্তু তীর ধনুক কোথায় পেলেন?

মোহনলাল কহিল—তীর ধনুকের বদলে আমার শব্দহীন পিস্তলের একটি গুলি খরচ করেছি। তাতেই কাজ হয়েছে।

সকলে একসঙ্গে বলিল—কোথায় সেই গুপ্তস্থান ?

—ক্রমশঃ প্রকাশ্য ! সময়ে সকলেই জানতে পারবেন।

জয়রাম আসিয়া জানাইল, বাবুদের খাবার দেওয়া হইয়াছে।

* * * *

নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া চারজনে অন্ধকারে অপেক্ষা করিতেছে। ঘড়িতে এইমাত্র এগারোটা বাজিয়া গেল। চারজনে তিনতালার ঘরে মৃত্যুদূতের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এ-ঘর বোধ করি কোন দিনই ব্যবহৃত হয় নাই। চারিদিকে ধূলা আর আবর্জ্জনা, দেওয়ালে ঝুল আর মাকড়সার জাল।

ইনসপেকটার কবীর কহিল—কতক্ষণ এ-ভাবে থাকতে হবে, মিঃ মিত্র !

—দরকার হলে সারা রাত। কিন্তু অত সময়ের প্রয়োজন হবে না। আর ঘন্টাখানেক।

সকলে আবার সজাগ উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল ! ঘরের একটিমাত্র দরজা। তাহার একপাশে মোহনলাল আর কবীর, অন্য পাশে সতু আর গোপেন।

দূরে রেলের ঘড়ীতে বারোটা বাজিল···সতু কি বলিতে যাইবে, মোহনলাল বলিল—শ্‌ শ্‌ শ্‌ ! চুপ !

ঘরের সংলগ্ন ঘোরানো লোহার সিঁড়িতে ঢুপ ঢুপ শব্দ ! কেহ বোধ হয় উপরে উঠিতেছে ! অসহ্য উত্তেজনায় সকলে কঠিন স্তব্ধ হইয়া রহিল।

পায়ের শব্দ নিকটে আসিল··· ঘরের বহিরে আসিয়া থামিল··· ক্যাঁচ করিয়া বন্ধ দরজা খুলিল···তারপর একটা ছায়ামূর্ত্তি ঘরের মধ্যে ঢুকিল !

"মৃত্যুদূত।"

লোকটার হাতে একটা তীর-ধনুক; মুখে বিভৎস সাদা মুখোস! ঘরে ঢুকিয়া সে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল।

চকিতের মধ্যে বাঘের মত লাফ্ দিয়া মোহনলাল তাহার উপর পড়িল। অতর্কিত আক্রমণে 'মৃত্যুদূত' হতভম্ব হইয়া গেল; মিনিট খানেক···তারপর তীর-ধনুক ফেলিয়া কোমর হইতে পিস্তল বাহির করিল।

পিস্তল সে ছুঁড়িল বটে, কিন্তু পিস্তলশুদ্ধ তাহার হাতখানা মোহনলাল তখন মাটির সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়াছে, গুলি দেওয়ালে লাগিল; চাপা শব্দ হইল, গুম্।

একসঙ্গে তিনটা টর্চ্চ জ্বলিয়া উঠিল; তারপর লোকনাথ আগস্তিকে বন্দী করা বিশেষ শক্ত হইল না!

বন্দী হইয়া নেক্ড়ের মত দাঁত বাহির করিয়া লোকনাথ শুধু বলিল—গোয়েন্দা মোহনলাল! বেঁচে আছ!

মোহনলাল কহিল—অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নেই; কিন্তু বেঁচে আছি লোকনাথ।

হাতকড়ি আর কোমরে-দড়ি লাগানো লোকনাথকে নীচে নামানো হইল। ততক্ষণে লোকটা সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইয়াছে; সহজভাবে কহিল—মোহনলালবাবু, তোমার কেরামতির চেয়ে সৌভাগ্যকে ধন্যবাদ দাও। আমায় ধরেছো নিতান্তই আমার দুর্ভাগ্য ব'লে! যাই হোক, এক কাপ চা খাওয়াবার ব্যবস্থা কর!

মোহনলাল কবীরের দিকে ফিরিয়া বলিল—একে চিনতে পারছো, ইনসপেকটার?

সবিস্ময়ে কবীর কহিল—চিনতে পারবো! তার মানে?

—শেষবার একে যখন বসিরহাটে ইহুদি হাজিমলের বাড়ীতে দেখেছিলে তখন এর মুখে এক জোড়া ঘন গোঁফ ছিল···

কবীর লাফাইয়া উঠিল—নরহরি!

ঘাড় নাড়িয়া মোহনলাল কহিল—নরহরি, ওরফে লোকনাথ

আগস্তি। আমি পূর্ব্বাহ্নেই জেনেছিলাম, তাইতো তোমায় বলেছিলাম, এই লোকটিকে পেলেই তোমার অন্য সমস্যারও সমাধান পাওয়া যাবে।

* * * *

আর-এক দফা সকলে রায় সাহেবের লাইব্রেরী-ঘরে সমবেত হইল। সকলেই প্রসন্ন ও প্রফুল্ল।

কবীর কহিল—কিন্তু মোহনলাল বাবু, কেমন ক'রে জানলেন যে নরহরি আর লোকনাথ একই ব্যক্তি?

মোহনলাল বলিল—রায় সাহেবের কথায় আমার মনে প্রথম খট্‌কা লাগে। তিনি বলেছিলেন, লোকনাথ বসিরহাট অঞ্চল থেকে তাঁকে চিঠি লিখেছিল। তারপর, তাকে দেখেই আমি চিনতে পেরেছিলাম।

কবীর কহিল—হাজিমলকে হত্যার উদ্দেশ্য বোধ হয় টাকা সংগ্রহের চেষ্টা?

—হ্যাঁ, তাই। হাজিমল চোরাইমালের কারবার ক'রে অনেক টাকা আর হীরাজহরৎ জমিয়েছিল। নরহরি জানতো সে কথা। সে হাজিমলকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের চেষ্টায় ছিল, কিন্তু যখন সফল হ'ল না, তখন তাকে খুন করলে। লোকনাথের রক্তের মধ্যে বোধ হয় মানুষ-খুনের ইচ্ছার বীজ ছড়িয়ে আছে। খুন করতে তার হাত কাঁপে না।

রায় সাহেব কহিলেন—লোকটা যে আমার আত্মীয় তা জানলেন কেমন ক'রে?

মোহনলাল বলিল—কোন রহস্যের সঙ্গে যারা জড়িত হয় তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি সংগ্রহ করা আমার একটি প্রধান কাজ। আমি যেমনি জানতে পারি যে রায় সাহেব পূর্ব্বেও একবার বিবাহ করেছিলেন তখনই আমি কলকাতায় আমার প্রতিনিধির কাছে টেলিফোনে আপনার প্রথম স্ত্রী এবং

তাঁদের পরিবারস্থ লোকজন সম্বন্ধে তদন্ত করতে বলি। তদন্তে প্রকাশ পায়, আপনার প্রথম স্ত্রীর একটি ভাই ছিল, সে দু'তিনবার জেল খেটেছে এবং অত্যন্ত সাংঘাতিক লোক। ভূত আমি মানি না; তাই 'মৃত্যুদুতের' ব্যাপার দেখে শুনে আমার বিশ্বাস জন্মায় যে বিশেষ সন্ধানী কোন ব্যক্তি এই ছদ্মবেশে ঘুরচে এবং তার আসল উদ্দেশ্য এই বাড়ীর মধ্যে ঢুকে কোন বিষয়ে কাজ হাসিল করা। তখন আমার বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে এর পিছনে আছে সরকার-বাড়ীর গুপ্ত-রত্ন। এই রত্ন সংক্রান্ত ইতিহাস যে জানে তার পক্ষেই বামনের ছদ্মবেশ ধারণ করা সম্ভব এবং এ কাহিনী আত্মীয়-স্বজনরা জানাই স্বাভাবিক। আমি আরও খবর পাই যে, লোকনাথ অল্পদিন জেল থেকে বেরিয়েছে এবং সম্প্রতি তার কোন পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। তখন আমার অনুমান সত্যের কোঠায় গিয়ে পৌঁছয়।

মোহনলালের বক্তব্য শেষ হইলে সকলে কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। তারপর সতু কহিল—এইবার গুপ্তরত্নের সন্ধানটা জানতে পারলেই···

মৃদু হাসিয়া মোহনলাল কহিল—সতু অধীর হ'য়ে উঠেছে—ওটা সম্বন্ধে কিন্তু আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি না; শুধু একটা অনুমান করেছি, সেই অনুসারেই আপনাদের বলছি।

সাগ্রহে রায় সাহেব বলিলেন—বলুন!

—তাহলে আপনারা আসুন আমার সঙ্গে।

সকলে সরকার-বাড়ীর পিছনদিককার বাগানে গেল। অদূরে সেই তিনতালার কক্ষ, যেখানে কাল রাত্রে লোকনাথকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। বাগানের মধ্যস্থলে একটি অর্দ্ধনগ্ন রমণীর মর্ম্মরমূর্ত্তি শোভা পাইতেছে।

সেই মূর্ত্তির কাছে গিয়া মোহনলাল বলিল—এই স্ট্যাচুর বা হাতের কাছে একটা দাগ দেখছেন; ওটা আমার পিস্তলের গুলির দাগ। তিনতালার ঘরের ছিদ্রপথ দিয়ে আমি যে গুলি ছাড়ি

পাঁচজন শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী রচিত

উপচয়নী

বাংলা উপন্যাসের প্রথম ওম্‌নিবাস।

পাঁচখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের একত্র

"এইরূপ উপন্যাস সংকলনের চেষ্টা এই প্রথম। প্রথম চেষ্টাতেই প্রকাশকগণের উদ্যোগ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। এই খণ্ডে আছে, রবীন্দ্রনাথের "নষ্ট নীড়", চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "হেরফের", সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "বৈরাগ-যোগ", প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর "প্রবাসী" এবং উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "অমলা"। সম্পাদক শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রকাশকগণের নির্ব্বাচন-পদ্ধতি প্রশংসনীয়। ছাপায়, কাগজে ও সজ্জায় এই ৪৫০ পৃষ্ঠার গ্রন্থে যে-ভাবে অর্থব্যয় করা হইয়াছে তাহাতে ৫৲ মূল্য অতিরিক্ত হয় নাই।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ই অক্টোবর ১৯৩৯।